রুদ্রের আবির্ভাব

ও

অন্যান্য গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
প্রণীত

শ্রীগুরু লাইব্রেরি
২০৪ কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রিট
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীসুখেন্দুবিকাশ মজুমদার,
৫৪-১ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রিট
কলিকাতা

দু ই টা কা

প্রিণ্টার—শ্রীমহেশ চন্দ্র পাত্র
'অবসর প্রেস'
৩৪ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রিট
কলিকাতা

গ্রন্থকারের অন্যান্য গল্প-গ্রন্থ :

টুটাফুটা

ইতি

অধিবাস

দিগন্ত

অকাল বসন্ত

সঙ্কেতময়ী

নায়ক-নায়িকা

মুহূর্ত

সূচীপত্র

রুদ্রের আবির্ভাব

বিবাহের পর ব্যোমকেশ কয়দিন হইতে আমার কাছে একটা চাকুরির জন্য ঘুরিতেছে। বলিলাম,—এখানে আমি চাকরি পাবো কোথায়? তবে কল্‌কাতায় যেতে চাও তো মামার কাছে লিখে দিতে পারি।

বড়োবাজারে পিপুলের দোকান করিয়া মামা বিস্তর পয়সা করিয়াছেন। তাঁহাকে লিখিয়া দিলাম। উত্তরে তিনি লিখিলেন: পরের জন্য মাথা না ঘামাইয়া নিজেই সোজা চলিয়া এস। গ্রামে বসিয়া কী কেবল পচিয়া মরিতেছ? চাকরি করিতে চাও তো একটা বন্দোবস্ত অনায়াসেই করিয়া দিতে পারিব। লোক আমারো চাই বটে, কিন্তু অনাত্মীয় অপরিচিতকে আমার একেবারেই ভরসা হয় না। কি করিব, ব্যবসা করিতেছি। কতো লিখিব, নিজে তুমি একবার আসিতে পারো না?

মামার চিঠি পাইয়া মনে-মনে হাসিলাম। গ্রামে বসিয়া পচিয়া মরিতেছি বটে!

ব্যোমকেশকে বলিলাম,—চাকরি করে' কী হ'বে? তোমাকে কিছু জমি ছেড়ে দিচ্ছি, চাষ করো! খাজনা বাবদ কিছু চাই না,ফসল হ'লে কিছু ভাগ দিয়ো না-হয়। কেমন, রাজি?

ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিল। গরু-লাঙল কিনিবার পয়সা নাই, আমিই ধার দিলাম। কিছু একটা মহৎ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতেছি এমনি ভাবে কহিলাম,—জমিতে সুবিধে না করতে পারো তো এই ধার তোমার শোধ করতে হ'বে না।

মহাসমারোহে ব্যোমকেশ লাঙল ঠেলিতে লাগিল। জাঁকালো ভাষায় খবরের কাগজে এক রিপোর্ট পাঠাইয়া দিলাম। বি-এ পাশ-করা ছেলে চাকুরির খোঁজে ফ্যা-ফ্যা না করিয়া নিজ হাতে জমি চষিতেছে—বড়ো-বড়ো হেড্‌লাইনে খবরটা দিগ্বিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। ব্যোমকেশ ভাবিল, কী যেন একটা করিতেছি! আমি ভাবিলাম, মামার উপর খুব একটা প্রতিশোধ নেওয়া হইল যা হোক্!

বাসন্তী প্রথমে এখানে আসিতে রাজি হয় নাই। কিন্তু চারিদিকের খোলা মাঠ, দূরে নদী ও নতুন ছবির মতো ঝক্‌ঝকে বাড়িখানি দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ছেলেবেলা হইতে সহরে মানুষ হইয়াছে, গ্রামের কথা শুনিতেই তাহার মনে গরুর গাড়ির চাকার একঘেয়ে করুণ আর্ত্তনাদের মতো একটা ক্লান্তিকর অবসাদ আসিত। কিন্তু অপর্য্যাপ্ত বাতাসে আঁচল ফুলাইয়া নদীর পাড়ে যখন আসিয়া সে দাঁড়াইল, তখন স্পষ্ট অনুভব করিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি আরো কালো ও গভীর এবং শরীরের সহুরে রুক্ষ শ্রী সবুজ ও ঠাণ্ডা হইয়া উঠিয়াছে। এতো বড়ো সাম্রাজ্যে তার কর্ত্রীত্ব অসীম: তাহার মুখের একটি কথায় জন-মজুর একশোখানা কাজ নিমেষে সমাধা করিয়া আনে। দেখিতে-দেখিতে তাহার হুকুমে সামনের জমিটা ফুলন্ত

বাগান হইয়া উঠিল; দুইটি সিসু গাছ যেখানে ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া ছায়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার নিচে বাঁশের একটি মাচা বাঁধা হইল—সেখানে সকাল বেলা সে পড়িবে ও বিকেলে বেড়াইয়া আসিয়া বিশ্রাম করিবে। বেড়ার গা বাহিয়া মালতীর লতা উঠিল, লোক লাগাইয়া আগাছা দূর করিয়া ছোট উঠানটি সে তাহার পায়ের পাতার মতো নরম ও তকতকে করিয়া তুলিল। দিল্লির দেওয়ানি-খাস্‌এর সিলিঙের মতো বাসন্তীও এইখানে ফুলের অক্ষরে লিখিয়া দিল যে, স্বর্গ বলিয়া যদি কিছু থাকে তো এইখানে, এইখানে!

বিবাহের দান-সামগ্রীর যাবতীয় জিনিস আসিয়া পৌঁছিল—দক্ষিণের ঘরটাকে ছোটখাটো একটা ড্রয়িং-রুম বানাইয়া ফেলিলাম। বন্ধু-বান্ধবের বালাই নাই, আমরাই পরস্পরের নির্জ্জনতা কথায় ও স্পর্শে, হাসিতে ও দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছি। বাসন্তী যখন একা ঘরে বসিয়া রান্না করে ও আমি যখন একা ঘরে বসিয়া গল্প লিখি, তখনো আমরা নির্জ্জন নই—যখন কিছু নেহাৎ করি না, তখনো আকাশ ও আলো, তারা ও অন্ধকার মিলিয়া আমাদের পরিপার্শ্বের শূন্যতাকে স্বপ্নের মতো আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

মা মারা যাইবার পর বাবা একা-একা এইখানে বসিয়া বিস্তৃত আকাশের সঙ্গে অপরিসীম বিরহ ভোগ করিতেছিলেন। আমি তখন কলিকাতায় মেস্‌-এ থাকিয়া কলেজে পড়িতেছি ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের যুবকের মতো কলেজ ঠিক না পালাইলেও শনিবার-শনিবার শ্বশুরালয়ে নিয়মিত আতিথ্য

নিতেছি। এবং আশ্চর্য্য এই, গল্পে-গুজবে খাওয়া-দাওয়ার অসাবধানে রাত্রি যখন বেশি করিয়া ফেলিতাম ও জোরে ঘণ্টা বাজাইয়া লাষ্ট ট্রামকে যখন অনায়াসে চলিয়া যাইতে দিতাম, তখন চট্ করিয়া মনে পড়িয়া যাইত যে আজ রাত্রে মেস্-এ যাইবার কোনো পথ-ই আর খোলা রাখি নাই। এবং শনিবারের রাতটাই যখন যাই-কি-না-যাই এমনি মিথ্যা উত্তেজনার মধ্য দিয়া কাটাইয়া দিলাম, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া রবিবারের রাতটাই বা ঘুমাইয়া লইতে কী হইয়াছে! এমনি এক সোমবার ভোরে অনিদ্রাক্লিষ্ট চক্ষু লইয়া মেস্-এ ফিরিয়া আসিয়া দেখি আমার নামে একটা টেলি কখন হইতে পড়িয়া আছে। খবর আর কিছু নয়, বাবা সন্ন্যাস রোগে মারা গিয়াছেন।

সে সব অনেক কথা। শ্বশুর-মহাশয় এখানেই একটা কাজ দেখিয়া লইতে বলিলেন—মেয়েকে চোখের কাছে রাখিবেন ও পচা পুকুরের জল ঘাঁটিতে দিবেন না এমনি একটা অজুহাতে আমার জন্য বাড়ি-ভাড়ার টাকা গুনিতেও রাজি হইয়া গেলেন। কিন্তু গ্রামে যাইবার কী যে গোঁ ধরিয়া বসিলাম, মনে হইল, ত্রেতা যুগে রাম হইয়া অবতীর্ণ হইলে সেই জোরে অনায়াসে হরধনু চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারিতাম। গ্রামে তো আসিলামই, বাসন্তীকেও সঙ্গে লইয়া আসিলাম। সে যতোই কেন না নাসাগ্রভাগ কুঞ্চিত করুক, এতো বড়ো আকাশ ও মাঠ-নদী ভরিয়া এতো প্রচুর জ্যোৎস্না তাহার দুই চোখে আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। বাপের বাড়িতে নিতান্তই সে পরগাছা ছিল, কিন্তু এইখানে সে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া উঠিয়াছে। জীবনে

কোথায় যে তাহার আসন, এতো দিনে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিয়া তাহার অহঙ্কারের আর সীমা নাই।

বাসন্তীকে লইয়া আসিবার সময় শ্বশুর-মহাশয়ের সঙ্গে ছোট-খাটো একটা বচসার সূত্র ধরিয়া ভীষণ কলহের অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গেল। তিনি সরাসরি বলিয়া বসিলেন: বাসন্তী যদি আমার কথার অবাধ্য হয়, তবে ওর মুখ আমি কখনো দেখবো না। বাসন্তীর মুখের দিকে তাকাইলাম,—সে ধীরে আমার পাশে সরিয়া আসিল। মেয়ের এই দুর্বিনীত ঔদ্ধত্য তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অস্ফুট একটা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বাসন্তীকে লইয়া ট্যাক্সি করিয়া ষ্টেশনের পথে আসিতে-আসিতে কহিলাম,—তুমি রামায়ণে সীতার মতোই একটা অসমসাহসিক সতীর দৃষ্টান্ত দেখালে।

রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বিয়ের সময় শ্বশুর-মহাশয় সখ করিয়া যাহা যৌতুক দিয়াছিলেন, স্পষ্ট রূঢ় কণ্ঠে তাহা দাবি করিয়া বসিলাম। খাট-টেবিল আল্‌না-দেরাজ বাসন-কোসন হইতে সুরু করিয়া বাসন্তীর চুলের পিন্ ও আমার ফাউণ্টেন-পেন্‌এর ক্লিপটি পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিল। সঙ্গে শ্বশুর-মহাশয় কড়া করিয়া একটা চিঠি দিয়াছিলেন বটে, যে, এই সব জিনিস ঘরে পুঁজি করিয়া রাখিতেও তাঁহার ঘৃণা হইতেছে, কিন্তু নিজের ঘরে পুঁজি করিয়া রাখিবারো যে কোনো কালে তাঁহার অধিকার ছিল না সবিনয়ে এই কথাটাও তাঁহাকে জানাইয়া রাখিলাম। যাহা হোক্, সেইখানেই যবনিকা পড়িল। কিন্তু বাসন্তী এতেও ক্ষান্ত হইল না,—সময়ে-অসময়ে কেবল নানাজাতীয়

ক্যাটালগ্ লইয়া নাড়া-চাড়া করে, আর এটা-ওটা ফরমাজ করিয়া কলিকাতার সাহেব-পাড়ার দোকানগুলিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। বিয়েতে নগদ যাহা কিছু পাইয়াছিলাম তাহা দিয়া বইয়ে-আসবাবে ঘর-দুয়ার ভরিয়া ফেলিলাম। পা-পোষের মতো পুরু কার্পেট হইতে সুরু করিয়া দেয়াল-জোড়া বড়ো-বড়ো দিশি-বিলিতি ছবিতে ঘর-দুয়ার গম্‌গম্ করিতে লাগিল।

নিজের শরীর সম্বন্ধে যতোটা না হোক্, গৃহ-প্রসাধনে বাসন্তী একেবারে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি কিন্তু গৃহ ছাড়িয়া গৃহ-স্বামিনীকেই শুধু দেখিতেছি। বাসন্তীকে দেখিতে এখন কতো যে সুন্দর হইয়াছে ভাবিয়া তৃপ্তির কূল পাইতেছি না। প্রত্যেক ছবির প্রকৃত আবেদন যেমন তাহার পটভূমিতে, তেমনি অন্তরালহীন আকাশের প্রতিবেশের মধ্যে এতোদিনে তাহার সত্যিকার রূপ উদ্ঘাটিত হইল! পায়ের রক্তাভ নখকণা হইতে সুরু করিয়া কৌতূহলাবিষ্ট ভুরু দু'টির চঞ্চল সঙ্কেতে লাবণ্যের তরল একটি নদীরেখা নিঃশব্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

বলিতাম,—এতো সব জিনিস-পত্রে ঘর বোঝাই করছ, এ তোমার দেখবে কে? লোককে দেখাতে না পারলে বিলাসিতায় সুখ কী!

বাসন্তী কোমরে আঁচলটা জড়াইতে-জড়াইতে কহিত,—কে আবার দেখবে? আমি আর তুমি।

হাসিয়া বলিতাম,—নিজেদের দেখার জন্যে নিজেরাই তো যথেষ্ট আছি। এ-সব বাজে আড়ম্বরে নিজেদের খালি সঙ্কীর্ণ করে' রাখা!

বাসন্তী সেই সব কথা শুনিবারই মেয়ে বটে! ততোক্ষণে পেট্রোম্যাক্সটা ফিট্ করিলে তাহার কাজ দিবে।

জীবনে নূতন একটি আবহাওয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত গাঢ়, প্রথম চুম্বনের মতো রোমাঞ্চময়। চারিদিকে কেমন একটা মুক্তির নিমন্ত্রণ পাইতেছি, আকাশের প্রত্যেকটি তারা বাসন্তীর দেহের প্রত্যেকটি স্পর্শের মতো পরিচিত, ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। বাসন্তীর দেহে নতুন স্বাদ, আমার অনুভূতিতে নতুন তীব্রতা! গ্রামের বিরাট সঙ্গহীনতায়ও নিজেদের কিছু নির্জ্জন লাগে না। যখন আমি ঘরে বসিয়া লিখি ও বাসন্তী রান্নাঘরে বসিয়া রান্না করে, তখন প্রকৃতি শব্দে ও নিঃশব্দে আমাদের মতো পরস্পরের কাছে অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। অথচ সহরের জন-বহুল বিপুল উৎসব-আয়োজনের মধ্যেও নিজেকে কতো একা ও অনর্থক মনে হইয়াছে।

এই নতুনতরো নেশা ছাড়িয়া আমি সহরে গিয়া চাকুরি করিব ও রাস্তায় চলিতে প্রতিমুহূর্ত্তে গাড়ি-ঘোড়ার উৎপাত হইতে বাঁচাইয়া চলিবার স্নায়বিক উত্তেজায় দিনের পর দিন ক্লান্ত হইতে থাকিব—শ্বশুর-মহাশয় আমাকে কী ভাবিয়াছেন!

বাবা নগদ টাকা কিছু রাখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু এই ছোট সুন্দর বাড়িখানি, বিঘে পাঁচ-সাত আবাদি জমি, কয়েক ঘর প্রজা—এই দিয়াই আমি আমার জীবনকে সুদীর্ঘ একটি রবিবারের সুরে ভরিয়া নিতে পারিব। চাকুরি করিব কোন্ দুঃখে? জীবিকা-নির্ব্বাহের ক্ষমাহীন কঠিন প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব এড়াইয়া এই যে অবারিত একটি আলস্য ভোগ করিতেছি, কী

বলিয়া ইহার তুলনা দিব! আমার এই অবকাশের আকাশ হইতে তারার স্ফুলিঙ্গের মতো কতো কাহিনী, কতো ঘটনা, কতো চরিত্র মূর্ত্তিময় হইয়া উঠিবে কে বলিতে পারে!

রাত করিয়া গাছ-পালা ঝাপসা করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। শিয়রে মোমবাতি জ্বালিয়া নতুন একটা গল্প লিখিতেছি। ইজিচেয়ারের গভীর কোলে ডুবিয়া গিয়া বাসন্তী কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কান পাতিয়া দূরে নদীর তরল কোলাহল শুনিতেছি।

আবছা অন্ধকারে বাসন্তীকে কেমন-যেন ক্লান্ত বলিয়া মনে হইল। মনে হইল গ্রামের এই অজস্র প্রশান্তি ধীরে-ধীরে তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। সে হয়তো গভীরতার বদলে বিস্তার কামনা করে—প্রচুর বৈচিত্র্যের মাঝে নিজেকে সে প্রকাশিত, বিকীর্ণ করিতে চায়—এইখানে তাহার আর ভালো লাগিতেছে না। একটানা বৃষ্টির শব্দে তাহার দীর্ঘশ্বাসটি স্পষ্ট কানে বাজিল।

পায়রার বুকের মতো তাহার নরম, তপ্ত দেহটিকে কোলে করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম। জাগিয়া উঠিয়া সে আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। কহিল,—আমার বড্ড ভয় করছে।

বলিলাম,—ভয়? ভয় কিসের?

আর সে কথা কহিল না। আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

মোমবাতিটা নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম। চারিদিকের রাশি-রাশি কোলাহল যোজনব্যাপী বিরাট স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে। এই কোলাহলও বাসন্তী সহ্য করিতে পারে না, তাহার ভয় করে। জনবিরল মাঠের মধ্য দিয়া ঝোড়ো হাওয়ার উদ্দাম দীর্ঘশ্বাস তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে, সারারাত ঘুমাইতে দেয় না।

কিন্তু ভোর হইতেই আবার সেই নিঃশব্দতা। বাসন্তী পরিচিত জগতে নামিয়া আসিয়া হাঁফ ছাড়ে। হাসিমুখে জিনিস-পত্র ঝাড়ে-পোঁছে, ঘর-দুয়ার ছুরির ফলার মতো ঝক্‌ঝকে করিয়া তোলে।

নদী কাল রাত্রে নাকি অনেকদূর ভাঙিয়া আসিয়াছে—বাসন্তীকে লইয়া তাহাই দেখিতে চলিলাম।

বৃষ্টি পাইয়া ব্যোমকেশের ক্ষেত মাতামাতি স্থরু করিয়াছে। গাঢ় সবুজে ফিকে সোনালির আভা দিয়াছে দেখা যায়। ব্যোমকেশের স্ফূর্তি আর ধরে না। সেও আমাদের সঙ্গে চলিল।

বেশি দূর যাইতে হইল না—নদীই যা-হোক অনেকটা আগাইয়া আসিয়াছে। এখনো তাহার আর্ত্তনাদ থামে নাই। সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া এখনো তাহার উত্তাল উৎসাহ। ভীষণ খাড়া পাড়, নিচে চাহিলে দস্তুরমতো পা কাঁপিতে থাকে। দাঁড়াইয়া আছ, অমনি তোমাকে বেষ্টন করিয়া মাটিতে প্রকাণ্ড একটা চিড়্ ধরিয়া গেল,

সাবধান না হইলেই অমনি তোমাকে শুদ্ধ্ গ্রাস করিয়া বসিবে। দূরে চাহিলে মনে হয়, একটা ফিন্‌ফিনে সাদা সিল্কএর আঁচল ঝাঁপাইয়া কে যেন সাঁতার কাটিতেছে—খালি পাড়ের কাছেই তাহার দিগ্‌বসনা রাক্ষুসি মূর্ত্তি! কাল শেষ রাত্রের দিকে নটবর ভূঁমালির ঘরটা নিয়াছে—অন্নের জন্য ছেলেপিলে লইয়া সে বাহির হইতে পারিয়াছিল; চালের কুটাটি পর্য্যন্ত বাঁচাইতে পারে নাই। নদী একটু জুড়াইলে সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে অন্তত তাহার স্ত্রীর গলার হাঁসুলিটা সে উদ্ধার করিতে পারে কি না। স্ত্রী মারা গিয়াছে পর এই একটিমাত্র চিহ্নই সে কোনোক্রমে আঁকড়াইয়া ছিল,—শত অভাবে পড়িয়াও তাহা সে বিক্রি করে নাই। কাহারো বাধা সে মানিবে না, জলটা একটু জুড়াইলেই সে নামিয়া পড়িবে। অমাবস্যা ছাড়িতে আর ঘণ্টা দুই মাত্র বাকি।

বাসন্তী বেশিক্ষণ সেইখানে আমাকে দাঁড়াইতে দিল না। গর্জ্জমান বিরাট নদীর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার ভয় করে। মনে হয় ফেনময় বাহু বাড়াইয়া অলক্ষ্যে সে আমাদের দু'জনকে ডাকিতেছে! পায়ের কাছের মাটিতে হঠাৎ একটা চিড়্ ধরিতেই সন্ত্রস্ত হইয়া বাসন্তীকে লইয়া পলাইয়া আসিলাম।

বিকেল হইলেই মা'র কোলে ঘুমন্ত খুকিটির মতো নদীর জল স্তিমিত হইয়া আসিল। বাসন্তী এতোক্ষণে হাসিয়া কথা কহিতে পারিতেছে। দু'জনে আবার বেড়াইতে বাহির হইলাম—ব্যোমকেশ অবশ্য এইবার সঙ্গে আসিল না। চলিতে-চলিতে শ্মশান ছাড়িয়া একটা নির্জ্জন মাঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছি।

রুদ্রের আবির্ভাব

নদী-ভাঙা প্রকাণ্ড একটা অশ্বথের গুঁড়ির উপর পাশাপাশি দু'জনে বসিলাম। সামনেই নদী—এখন দেখিতে নিতান্তই বাঙালি মেয়ের মতো নিরীহ : রূপালি গলায় মৃদু-মৃদু কথা কহিতেছে। যতো ভাবি নদীর দিকে বেড়াইতে আসিব না, ততোই নদী আমাদের কাছে টানিয়া আনে। আর যাইবারই বা জায়গা কোথায়? যেখানে যাইব, সেইখানেই নদী তাহার চঞ্চল ও সুনীল চক্ষু মেলিয়া রাখিয়াছে! দেখিতে-দেখিতে কতো কাছে যে আগাইয়া আসিল। আমাদের বাড়ির দক্ষিণে যে ঝাউগাছের সারি ঘন হইয়া দাঁড়াইয়া আকাশকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল, দেখি তাহা হঠাৎ কোনদিন ফাঁকা হইয়া গেছে! এখন দক্ষিণটা একেবারে সাদা, সবুজ বা নীলের কোথাও এতোটুকু বাধা নাই—যেন অবিনশ্বরতার গাঢ় রঙ। এত বড়ো মুক্তির চেহারা দেখিয়া দুইজনে মনে-মনে ভীত হইয়া পড়ি, কিন্তু সেই ভয় পরস্পরের থেকে লুকাইতে গিয়া আরো সহজে ধরা পড়িয়া যাই।

যে-জায়গাটায় আসিয়া বসিলাম তাহা গাছ-পাতার আড়ালে কা'র একটি কুটিরের নিভৃত আঙিনায়। কোনো চাষা-ভুষোর বাড়ি হইবে, নদী কাছে আসিয়া পড়ায় আগেই বিদায় নিয়াছে। ছোট উঠানটি ঘিরিয়া সংসারের ছোট-ছোট চিহ্ন এখনো এখানে-সেখানে ছড়ানো আছে দেখিলাম। তাড়াতাড়িতে সব জিনিস হয়তো সরাইতে পারে নাই—মানুষের প্রাণের চেয়ে কতোগুলি ডালা-কুলোর দাম তো আর বেশি নয়। তবু সেই পরিত্যক্ত, শূন্য ঘরের নিরানন্দ চেহারা দেখিয়া মন ভারি বিমর্ষ হইয়া উঠিল। এখন তাহারা কোথায় উঠিয়া গেছে না জানি!

বাসন্তী হাল্‌কা সুরে অনেক সব কথা কহিতে লাগিল। সম্প্রতি এখানে সে ছোটখাটো একটা পাঠশালা করিতে চায়—বিনে-মাইনেয় ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে পড়াইয়া তবু যা-হোক্ করিয়া দিন তাহার কাটিবে। আমি উহার আবদার চিরকাল পালন করিয়াছি, আজো কহিলাম,—সরকার-মশায়কে বলে' দেব, সামনের বাগানের ধারে তালপাতার ছাউনি দিয়ে একখানা ঘর তুলে দেবেন।

বাসন্তী ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল,—একটুখানি তো ঘর, তা আবার তালপাতার কেন? রানিগঞ্জের টালি দেবে।

—একটুখানি বলে'ই তো তালপাতার বল্‌ছি।

—গরিব ছেলেমেয়েরা পড়বে বলে'ই বুঝি এমনি হেনস্তা করতে হয়? বেশ পাকা দালান হ'বে—উঁচু ক্লাসের ছাত্র জুটলে তুমিও মাষ্টারি করতে পারো,—অবশ্যি আমি যদি দরখাস্ত মঞ্জুর করি। দু'জনে কাজ পেয়ে বেঁচে যাবো। এমনি আর পারিনে।

বলিলাম,—খালি পাকা দালান হ'লেই চল্‌বে?

—বা, বেঞ্চি-চেয়ার কিনতে হ'বে না? গ্লোব, ম্যাপ, ব্ল্যাকবোর্ড, আলমারি—সে-সব ফর্দ্দ আমি ঠিক করে' রাখবো। সরকার-মশায়কে বলে' তুমি কেবল টাকা জোগাড় করে' দেবে।

—সে যে অনেক খরচ।

—টাকা তবে আছে কী করতে? এ তো আর বাজে কাজে উড়োচ্ছি না, দস্তুরমতো দেশের কাজ।

—কিন্তু টাকা পাবো কোথায় ?

—সরকার-মশায়কে বল্‌লেই তিনি বন্দোবস্ত করে' দেবেন। কাজ ছাড়া আমি বাঁচি কী করে' বলো ? ওদিকে আমার ভারি-হাতে একটা অসুখ করুক, তখন তো উঠে পড়ে' খরচ করতে সুরু করবে ! কেমন, ঠিক কি না।

তাহার একটি হাত নিজের মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম। মাথার উপর দিয়া এক ঝাঁক গাঙ-শালিক উড়িয়া গেল। পাখার চাঞ্চল্যে সমস্ত নিঃশব্দতাটা হঠাৎ স্বচ্ছ, তরল হইয়া আসিল। দূরে খেজুর গাছের দীর্ঘ পাতার ফাঁকে একটি তারা উঠিয়াছে। সূর্য্য কখন ডুবিয়া গিয়াছে খেয়াল করি নাই।

অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেই নদীকে পিছনে রাখিয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম। যতো এগোই, ততোই মনে হয় নদীও যেন নিঃশব্দে আমাদের অনুসরণ করিতেছে ! পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখি নিঝুম কালো নদী বালির বিছানায় গা এলাইয়া ঘুমাইতেছে,—কোথাও যেন এতটুকু নিশ্বাসের স্পন্দন নাই। দেখিয়া ভারি নিশ্চিন্ত হইলাম। বাসন্তী আমার দিকে চাহিয়া কেমন করিয়া যেন হাসিল।

দিন পনেরো-কুড়ির মধ্যে বাসন্তীর স্কুলের দালান উঠিয়া গেল। ।

বাসন্তীর আনন্দ দেখে কে ! নিতাই কামারের দুইটি ছেলে নিয়া সে অ-আ সুরু করিয়া দিল। ইহাদের একটিও যে ভবিষ্যতে হাইকোর্টের জজ হইবে না এমন কথা হলফ করিয়া বলিবার আর সাহস রহিল না।

রুদ্রের আবির্ভাব

দুপুরের আগেই বাসন্তী খাওয়া-দাওয়ার পাট তুলিয়া 'ডাষ্টার' ও খড়ি লইয়া ইস্কুলে গিয়া ঢোকে, আর নিতাই কামারের দুরন্ত দুই ছেলে অক্ষর ভুলিয়া যতোই ঘরময় দাপাদাপি করিতে থাকে, বাসন্তীর উৎসাহ ততোই বাড়িয়া যায়। শাসন করিবার পদ্ধতিটা তাহার অতিমাত্রায় আধুনিক। একটুও রাগে তো সে না-ই, বরং দুরন্ত ছেলে দুইটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুমায়-চুমায় চোখ-মুখ আচ্ছন্ন করিয়া উহাদের সায়েস্তা করিতে চেষ্টা করে।

দক্ষিণের কোঠায় বসিয়া আমি তাহা দেখি ও লিখিবার কিছু প্লট্ খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে একটি সন্তানকামনাতুরা নারীর নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা লইয়া গল্প লিখিবার ভাষা খুঁজিয়া বেড়াই।

গ্রামে সম্প্রতি কে-একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছে। যাগ-যজ্ঞ করিয়া নদী শুকাইয়া দিবে বলিয়া আমাদেরই সম্মুখে মাঠে তাঁবু গাড়িয়াছে। সেখানে আজ বড়ো ভিড়। পূজা যখন একটা হইবেই, প্রসাদ নিশ্চয় আর বাদ পড়িবে না—অতএব সেইখানে না গিয়া এইখানে বসিয়া ভালুকের মতো ভীষণ দুইটা অক্ষরের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া তাহাদের অবয়বের অলৌকিক গঠন-প্রণালীটা আয়ত্ত করিতে হইবে নিতাই কর্ম্ম-কারের ছেলেরা তাহা বরদাস্ত করিতে পারিল না। বাসন্তীর আঁচলের তলা হইতে কখন ছুটিয়া পলাইল।

বাসন্তী বিরত হইবার মেয়ে নয়। কখন আবার ইস্কুলের জন্য উমেদারি করিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

মাসখানেক কাটিয়া গেল। এত করিয়াও ছেলেতে-মেয়েতে মিলাইয়া চার-পাঁচটির বেশি সে জোগাড় করিতে পারিল না।

নদীতে গ্রাম লোপাট হইতে চলিল, বাসন্তীর হাতে দিগ্‌গজ হইবার জন্য কে এখানে সখ করিয়া বসিয়া থাকিবে ?

সন্তানকামনাতুরা নারীর সেই গল্পটা আজ রাত্রে ঘুমাইবার আগে বাসন্তীকে শুনাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু নদীর গর্জ্জনের সঙ্গে রাত্রির অপার নিঃশব্দতা মিলিয়া তাহাকে এমন অভিভূত ও ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছে যে, প্রস্তাবটা পাড়িবার আগেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার শুইবার ভঙ্গিটা এত করুণ ও কৃশ যে মায়া করিতে লাগিল। নুইয়া পড়িয়া তাহার দেহে—রাত্রির নিঃশব্দতার মতো শীতল দেহে চুমা খাইলাম, কিন্তু সে একটুও সাড়া দিল না। ভাটার নদীর মতো নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া রহিল। আশ্চর্য্য, আমার কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল, নদীর এই ক্ষিপ্ত উদ্বেলতা বাসন্তীর যৌবনকে ক্রমে-ক্রমে ম্লান, স্তিমিত করিয়া আনিয়াছে। নদীর লবণাক্ত, তিক্ত স্বাদের কাছে বাসন্তীর দেহের মদিরা অনেকাংশে জলীয়, তাহাতে আর সেই আনন্দময় জ্বালা নাই। নদী এখন এত প্রত্যক্ষ, এত নিদারুণ, এত অজস্র-উচ্ছ্বসিত যে বাসন্তীকে সে অনায়াসে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। প্রকৃতির কাছে মানুষের এই অপ্রতিবাদ পরাভব ইহার আগে আর কখনো দেখিয়াছি বলে মনে পড়ে না।

বাসন্তীর আর সেই লীলা নাই, সেই আবেগের আগুন তাহার নদীর জলে নিভিয়া গেছে। আমি বোধহয় দিনে-রাত্রে নদীর এই উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিলাম—বাসন্তীকে আর চোখে ধরিল না।

রুদ্রের আবির্ভাব

গফুর তরি-তরকারি বেচিয়া দিন গুজ্‌রাইত, একদিন সপরিবারে সে আসিয়া আমার কাছে ইস্কুল-ঘরে থাকিবার মিনতি জানাইল,—কাল রাত্রে তাহার ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার নদীর জলে উজাড় হইয়া গেছে। আজ রাতটা কোনো রকমে কাটাইয়া সে অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে—কোথায় সে যাইবে এখনো তাহা ঠিক করে নাই। বাসন্তীর থেকে চাবি চাহিয়া সরকার-মহাশয়কে দিয়া দরজা খুলাইলাম। উহাদের জায়গা হইল—এবং দেখিতে-দেখিতে ইস্কুল-ঘরটা বিচিত্র একটা ধর্ম্মশালার চেহারা নিয়া বসিল। কাহারো নড়িবার নাম নাই। শেষে কেবলই মনে হইতে লাগিল, নদী এই হতভাগাদের খুঁজিয়া ফিরিতেছে—উহাদের না সরাইলে হয়তো আমারই দরজার কাছে আসিয়া হানা দিবে! গরুর গাড়ি ডাকাইয়া পোঁটলা-পুঁটলিতে চিঁড়ে-চাল বাঁধিয়া উহাদের পথ দেখিতে বলিলাম। রাজি না হওয়া ছাড়া উহাদের উপায় ছিল না—উহাদের তাড়াইবার জন্য বাসন্তী এমন বিজাতীয় গোঁ ধরিয়াছে! যদি ক্ষুধার তাড়নায় একদিন সকলে মিলিয়া লুঠ-তরাজ করিয়া আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ফেলে! উহারা একে-একে বিদায় নিল বটে, কিন্তু নতুন গৃহ-প্রবেশের সম্ভাবনায় কেহ যে বিশেষ খুসি হইল এমন মনে হইল না। রাজা মিঞা তো ঝাঁজালো গলায় দস্তুরমতো শাসাইয়া গেল যে, এমন করিয়া যে গৃহহীনদের তাড়ায়, রাক্ষুসী নদী তাহাকেও তাড়াইয়া ফিরিবে!

আমাদের অতিথিবৎসল না হওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না।

কয়েকদিন পরেই আরেক দল লোক আসিয়া হাজির—ইস্কুল-ঘরে আজ রাত্রের জন্য তাহাদের ঠাঁই দিতে হইবে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল,—কণ্ঠস্বরটা যে কাহার প্রথমে ঠিক চিনিতে পারিলাম না। জানলা ফাঁক করিয়া দেখিলাম লোকটার পিছনে একটি স্ত্রীলোক ও তাহাকে ঘন করিয়া ঘিরিয়া কতকগুলি শিশু ভিজা কাপড়ে হি-হি করিয়া কাঁপিতেছে—এত বড়ো আকাশের তলে কোথাও তাহাদের এতটুকু আশ্রয় নাই। লণ্ঠন জ্বালিয়া ছাতা মাথায় দিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম এ আর কেহ নয়, আমারই প্রজা—নবীন মাইতি। বুঝিতে বাকি রহিল না, নদী আমারো জমিতে থাবা বসাইয়াছে!

বলিলাম,—ঘর-দোর সব গেলো?

নবীন গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—সব বাবু, কোনো রকমে সেরে আসতে পেরেছি। আজই এমন ঝড়-বৃষ্টি করে' না এলে আরো কিছুদিন থাকতে পারতাম। এখন আপনি জায়গা না দিলে ছেলে-পুলে নিয়ে কোথায় যাই বলুন।

পরিষ্কার বুঝিলাম, তাহার কাছে যে বাকি-খাজনা পাওনা ছিল, নদী তাহাও কাড়িয়া নিয়াছে।

ধমক দিয়া উঠিলাম: সময় থাকতে সরতে পারিস নি? জিনিসপত্র কতক তো অন্তত বাঁচ্‌তো।

কিন্তু ধমকাইয়া তাহাকে কী করিব? স্ত্রী-পুত্র লইয়া যে বাঁচিতে পারিয়াছে, এই ঢের—তুচ্ছ কতগুলি জিনিস দিয়া তাহার কী হইবে?

নবীন মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কহিল,—তাড়াতাড়িতে এই মাদুর আর বালিশ দু'টো শুধু নিতে পেরেছি—

ও-দিক হইতে নবীনের ছোট ছেলে বলিয়া উঠিল : আর আমি আমার নাটাইটা, বাবা !

মুখ-চোখ বিবর্ণ করিয়া সরকার-মহাশয় ভয়ে-ভয়ে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লেখা হইতে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম : আজকে কী নতুন খবর ?

সরকার-মহাশয়ের মুখে তক্ষুনি ভাষা জুয়াইল না। অনেক ঢোঁক গিলিয়া পরে কহিলেন,—আমগাছগুলি কাল গেছে।

বিস্মিত হইব না ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু খবরটা এমন মর্ম্মান্তিক যে মনে হইল যেন এইমাত্র কোনো আত্মীয়তম পরমবন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনিতেছি। চমকাইয়া উঠিলাম : কোন আমগাছ ?

—সব। সরকার-মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারিলেন না।

মনে আছে গত বৎসর এমনি বৈশাখের সন্ধ্যায় বাসন্তীকে লইয়া এই আমবাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বিন্দুমাত্র আভাস না দিয়া নির্লজ্জ এই নদীর বন্যার মতো অকস্মাৎ আকাশে তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল। জোরে বাতাস ছাড়িতেই কাঁচ-কাঁচ আম অজস্র শিলাবৃষ্টির মতো এখানে-ওখানে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল,—কোঁচড় বাঁধিয়া বাসন্তীর সে কী আম কুড়াইবার

ঘটা! ধূলায় সমস্ত মাঠ-বাড়ি একাকার হইয়া গেছে, খানিকটা গরম থাকিয়া সমস্ত শূন্য পাথরের মতো ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, কোথায় কাহাদের গরু-ছাগল ভয় পাইয়া চীৎকার পাড়িতেছে—বৃষ্টি এই আসিল বলিয়া! আর আকাশের যেমন চেহারা, বৃষ্টি একবার আসিলে সহজে থামিবার নাম করিবে না। কিন্তু কথা শুনিবার মেয়ে বাসন্তী নয়। হাওয়ায় চুল ও আঁচল এলো করিয়া প্রাণপণে সে আম কুড়াইতে লাগিল। ঝড় এমন দুর্দান্ত যে তাহাকে প্রবল পুরুষ-স্পর্শের আলোড়নে একেবারে বিপর্যস্ত, ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বলিলাম,—কেন এতো ব্যস্ত হচ্ছ? ঝড় থামলে চাকরকে পাঠিয়ে দেব, সব আম কুড়িয়ে নেবে। বাগান তো আমাদেরই— ভাবনা কিসের? বাসন্তী তবুও কথা শুনিল না। উন্মত্ত বাতাসে কাপড়ের প্রান্ত উড়াইয়া পিঠময় চুলের ঢেউ তুলিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে আম কুড়াইতে লাগিল। আবহাওয়াটি এত গম্ভীর ও এত ভয়ঙ্কর যে তাহাকে আমার অত্যন্ত অপরিচিত ও অপরিচিত বলিয়াই প্রখরতররূপে সুন্দর বলিয়া মনে হইল।

বাসন্তীকে বলিলাম,—চলো, একবার দৃশ্যটা দেখে আসি।

নিজে তো যাইবেই না, আমাকেও সে জোর করিয়া আঁকড়াইয়া রহিল। খবরটা তাহার কাছে এত নিদারুণ যে শতপুত্রশোকে গান্ধারীর মতো সেও বোধহয় অন্ধ হইয়া যাইবে।

আজকাল আমরা আর বেড়াইতে বাহির হই না, স্থানের ও সময়ের সমস্ত পরিধি নদী অনায়াসে লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। ঘরে বসিয়াই নদী দেখি, প্রচুর হাওয়ায় দেয়ালের প্রকাণ্ড ছবিগুলি

মেঝের উপর ভাঙিয়া পড়ে। বিস্তৃত জলরাশির কিনারে মর্ত্তের দুইটি প্রাণী মৃত্যুর প্রলোভন এড়াইয়া কোন রকমে একের পর এক মুহূর্ত্ত গুনিতেছি!

তারপর আসিল ব্যোমকেশ। খবরটা ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার দরকার ছিল না, সময় থাকিতে বুদ্ধিমানের মতো হাটে গিয়া সে যে লাঙল ও বলদ বিক্রি করিয়া আসিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে তারিফ্ করিলাম—পয়সাটা ঠিক তাহারই প্রাপ্য কিনা তাহা আর বিচার করিয়া দেখিলাম না। কেবল এই-ই দুঃখ হইতে লাগিল যে, তাহাকে এইবার সত্যি-সত্যিই চাকরির জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। কিন্তু খবরের কাগজের সম্পাদক সেই কথা জানিতে আসিবেন না; জানিলেও এত বড়ো ব্যর্থতার কথা সসমারোহে ছাপিবার আর তাঁহার আগ্রহ থাকিত না। প্রকৃতির কাছে মানুষের এই পরাভবের ব্যর্থতার মধ্যে মহিমা নাই, এই পরাজয় মানুষের নিজের সৃষ্টি নয় বলিয়া। এত দুঃখেও ব্যোমকেশ তাই সুখী হইতে পারিল না।

এইবার সময় হইল। শত-লক্ষ হাত মেলিয়া নদী স্কুল-ঘরটাকে আক্রমণ করিয়াছে।

নবীন আগেই সরিয়াছে, অতএব তাহার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইবার নাই।

বাসন্তী বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল,—অমনি-অমনি যেতে দেবে নাকি?

এত বড়ো বিপদের সম্মুখে পড়িয়াও যদি বাসন্তী দার্শনিক না হয়, তবে কী করিতে পারি? বলিলাম,—কোন জিনিস তুমি আঁকড়ে ধরে' রাখতে পারো শুনি? যা যায়, যাক্।

বাসন্তী কহিল,—কিন্তু টুল-চেয়ারগুলিও তো বেচতে পারতে?

—কোথায় বেচবো? কিনবে কে? কতোই বা দাম পাওয়া যাবে? পয়সা যা পাবে তাও কি অমনি যাবে না খরচ হ'য়ে? ও নিয়ে মিথ্যে মন খারাপ করো না—দেখ, মৃত্যুর এমন চমৎকার চেহারা আর দেখেছ কখনো?

দক্ষিণের কোঠায় পাশাপাশি চেয়ারে দুইজনে বসিলাম। দেখিলাম সরকার-মহাশয় লোক লাগাইয়া স্কুল-ঘরের জিনিস-পত্র বাহির করিতেছেন। মনে-মনে হাসিলাম, কোথায় এগুলি তিনি সরাইয়া রাখিবেন—কত দূরে? কে ইহাদের বোঝা টানিয়া বেড়াইবে? তবু নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ইহাদের তুলিয়া দিতে সরকার-মহাশয়ের মন যেন কেমন করিতেছিল।

হাওয়ায় বাসন্তীকে একেবারে উড়াইয়া নিতেছে। নদী যত তাহার আবরণ কাড়িয়া লইবার জন্য কাড়াকাড়ি করিতেছে, ততই সে কুণ্ঠিত, ম্রিয়মাণ হইয়া এতটুকু হইয়া যাইতেছে। ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো তাহাকে এমন দুর্ব্বল লাগিল—এই বিরাট সৌন্দর্য্য-সমারোহের মাঝে সব এমন অকিঞ্চিৎকর মনে হইল যে সেই মুহূর্ত্তে বাঁচিয়া থাকিবার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না!

আমাদের চোখের সমুখে স্কুল-ঘরের একটা ধার নদীর মধ্যে ধ্বসিয়া পড়িল। বাসন্তী সভয়ে একটা চীৎকার করিয়া উঠিতেই তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া কহিলাম,—ভয় কী!

বুকে মুখ গুঁজিয়া বাসন্তী কাঁপিতেছে; চাপা গলায় কহিল,—একেবারে আমাদের পায়ের কাছে এসে পড়লো যে।

—আসুক। বাড়ি নিতে এখনো দেরি আছে! পূব দিক ঘেঁসে চরও পড়ছে শুনছি—সবাই ত বলছিলো এই বর্ষাটা কোনো রকমে কাটিয়ে উঠতে পারলেই বেঁচে গেলাম। ভয় কী, বাসন্তী? আর যদি যায়-ই, যাবে—জিনিস-পত্র স্তূপাকার করে' রেখে লাভ কী? দু'জনে আবার ফাঁকা হ'য়ে যাবো।

বাসন্তী তেমনি মুখ গুঁজিয়া কহিল,—আমি চোখ মেলে তা দেখতে পারবো না। তার আগেই আমরা এখান থেকে পালাবো।

আস্তে-আস্তে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই স্কুল-ঘরটা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নিতাই কর্ম্মকারের ছেলেরা মুন্সেফ-কোর্টের সামান্য একটা পেসকারও আর হইতে পারিল না।

এখন একবারে নদীর কোলে শুইয়া আছি। ফুলের বাগানটাও গেছে। এখন এক পারে আমি আর বাসন্তী, আর আমাদের সমুখে নদী—স্রোতমুখর, ফেনিল, লালায়িত,—সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া, কাড়িয়া তাহারই মতো আমাদের সে বস্তুর জগতে একবারে উলঙ্গ করিয়া দিবে।

কৌচগুলিতে ধূলা জমিতেছে, আলমারির কাচগুলি আর পরিষ্কার

করা হয় নাই। কার্পেটটা জায়গায়-জায়গায় ফুটা হইয়া গিয়াছে—সেই দিকে কাহারো লক্ষ্য নাই। টিপয়ের উপর পিতলের বড়ো ডাবরে পাতবাহারের গাছ দুইটা কবে মরিয়া গেছে—কে আর উহাদের আদর করিয়া জল দিবে! দেয়ালের বড়ো ক্লকটা বন্ধ, চাবি দিতে ভুলিয়া গেছি। অনেক দিন ধোপা অসিতেছে না—বিছানার চাদর ও বালিসের ওয়াড়গুলি এত ময়লা হইয়া গেছে যে যেন তাহারই জন্য আমাদের চোখে ঘুম আসে না। ক্যালেণ্ডারের তারিখ বদলানো হয় নাই কতদিন—জানিবার কিছু প্রয়োজন বোধ করি না। পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া কেবল সেই পরম ক্ষণটির প্রতীক্ষা করিতেছি।

বাসন্তী অস্থির হইয়া বলিল,—এখানে থেকে কী হ'বে—চলো, পালাই।

বলিলাম,—নাটকের শেষ অঙ্কটাই নাটকের সমস্ত। একেবারে যবনিকা পড়লে তবে উঠবো। এমন একটা চমৎকার দৃশ্য দেখতে তোমার কুণ্ঠা কিসের?

—এ আমি সইতে পারবো না।

—যা কিছু অসহ্য, তাইতেই তো তীব্র আনন্দ আছে! বলিয়া বাসন্তীর মুখে চুমা খাইলাম। যেন ভালো লাগিল না। উহার চেহারা এই ঘর-বাড়িরই মতো কেমন রুক্ষ, বিবর্ণ হইয়া গেছে! কতদিন উহাকে একটু আদর পর্যান্ত করি নাই। মৃত্যুর এই অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের মাঝে ক্ষণভঙ্গুর প্রেমের অভিনয় করিতেও হাসি পায়।

রুদ্রের আবির্ভাব

ভিতরের উঠান ছাড়াইয়া খানিক দূরে সরকার-মহাশয় সময় থাকিতে ছোট-খাটো একখানি ঘর বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। সময় আসিলে এই বাড়ি ছাড়িয়া সেখানে উঠিয়া যাইব। তাহার পরেও যে নিস্তার নাই তাহাও সরকার-মহাশয় ভালো করিয়া জানিতেন; তবু আবশ্যকীয় জিনিস-পত্র সরাইয়া রাখিবার জন্য হাতের কাছে একটা আশ্রয় থাকা উচিত। কোন জিনিসগুলি যে অধিকতর আবশ্যকীয়, ঘরের চারিদিকে চাহিয়া চট্ করিয়া ভাবিয়া নিতে পারিলাম না। বাসন্তীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোনো লাভ নাই—সবগুলি জিনিসই একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার—কোনটা ছাড়িয়া কোনটার প্রতি যে সে পক্ষপাতিতা দেখাইবে সে একটা কঠিন সমস্যা। অতএব মাত্র শুইবার খাটখানা, বিছানা-পত্র, কাপড়-চোপড় ভরিয়া একটা বড় ট্রাঙ্ক, লিখিবার ছোট একটি টেবিল, এমনি মোটামুটি কয়েকটা জিনিস সরাইয়া রাখিলাম। আমার গল্পের খাতা ও বাসন্তীর গহনার বাক্সটা হাতের কাছেই রহিল—নদী আসিয়া পড়িলে সেগুলিও সঙ্গে নিতে হইবে।

ছোট ঘরখানি—রানিগঞ্জের টালিতে নয়, উলুখড়ে কোনোরকমে ছাওয়া হইয়াছে। চাকর সেই ঘরে একটি বাতি জ্বালিয়াছে দেখিলাম। বিপুলকায় গর্জ্জমান নদীর পাড়ে বসিয়া ঐ মৃদু শিখাটিকে ভারি করুণ মনে হইতে লাগিল। বাসন্তী বলিল,—চলো, ঐ ঘরে আজই উঠে যাই।

অভয় দিয়া বলিলাম,—আজই কী! এখনো হাত পঞ্চাশ দূরে আছে। আজ রাতটা অনায়াসে এখানেই ঘুমিয়ে নিতে পারবো।

রুদ্রের আবির্ভাব

জল, জল, ক্ষুরের মতো ধারালো, বিদ্যুতের মতো দ্রুত,—ধাবমান ঘোড়ার মতো ঢেউগুলি পাড়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িতেছে। কোথাও এতটুকু বিশ্রাম নাই, স্তব্ধতা নাই—ফুঁসিয়া-গর্জ্জিয়া ছিঁড়িয়া-কাড়িয়া অনড়, স্থবির মৃত্তিকাকে একেবারে চূর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া দিবে। অমন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দিবে না। সেই নিয়তবেগবান বিরাট শক্তির কাছে আমাদের অস্তিত্ব কেমন ম্লান, সঙ্কুচিত হইয়া গেছে। পরিমিত নিশ্বাস ফেলিয়া আমাদের এই জীবনধারণের তুচ্ছতাকে নদী যেন চারিদিকের উগ্র খলহাস্তে বিদ্রূপ করিয়া উঠিল।

জল আর জল—সাদা, গাঢ় জল! বেগের প্রাবল্যে কোথাও এতটুকু বিশ্রামের রঙ নাই—ফেনায়িত, প্রখর সাদা! অমন তীব্র শুভ্রতা চক্ষু মেলিয়া সহ্য করিতে পারি না।

রাত্রে কখন একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—ঘুমের মধ্যেও নদীর সেই ডাক শুনিতেছি। তাহার আর ঘুম নাই, প্রবল আর্ত্তকণ্ঠে কী যেন সে চাহিতেছে! তাহার ভাষা বুঝিতে পারি না, কী যেন সে চাহিতেছে—সেই ভাষা আমরা কি করিয়া বুঝিব!

হঠাৎ কোথায় কী একটা শব্দ হইল—হয় তো এক চাক্ মাটি পড়িল—সঙ্গে সেই শিমুলগাছটাও। ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম—দেখি পাশে বাসন্তী নাই। চারিদিকে প্রবল শব্দে ঝড় বহিতেছে—চীৎকার করিয়া উঠিলাম: বাসন্তী।

কোথাও এতটুকু সাড়া মিলিল না।

তাড়াতাড়ি খাট হইতে নামিয়া পড়িলাম। আলো জ্বালিবার কথা মনেও হইল না। দেখি, দক্ষিণের দরজাটা খোলা, প্রচুর উচ্ছ্বসিত হাওয়ায় ঘরের মধ্যে ধূলা উড়িতেছে—এত বাতাসে ও ধুলায় নিশ্বাস টানিতে কষ্ট হইতে লাগিল। আবার ডাকিলাম: বাসন্তী। অজস্রকণ্ঠে নদী ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল। স্পষ্ট মনে হইল, নদীর ডাকে বাসন্তী কখন দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

পাগলের মতো সামনের জমিতে ছুটিয়া আসিলাম। ঝাপ্‌সা অন্ধকারে খেজুর-গাছের নিচে কি-একটা কাপড়ের মতো চোখে পড়িল। কাছে আসিয়া দেখি—বাসন্তী নদীর পাড়ে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

ব্যস্ত হইয়া কহিলাম,—এখানে উঠে এসেছ যে!

সে যেন কেমন করিয়া হাসিল; কহিল,—একটুও ঘুম আসছে না। বলিয়া আবার স্তব্ধ হইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। প্রবল চাঞ্চল্যের তীরে তাহার এই ধ্যানময় স্তব্ধতা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মনে হইল। তাহাকে বেষ্টন করিয়া এই নির্জ্জনতা এমন ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাকে আমার অতি-পরিচিত বাসন্তী বলিয়া যেন চিনিতে পারিলাম না।

গায়ে ঠেলা দিয়া কহিলাম,—এখানে বসে' আছ কী করতে? ঘরে চলো!

বাসন্তী কহিল,—এই বেশ লাগছে। তুমিও আমার পাশে এসে বোস না।

তাহার পাশে বসিলাম ; কিন্তু তাহার পর কী যে বলিব বা বলা যাইতে পারে—সমস্ত ভাষা নীরব হইয়া গেল। উহার সঙ্গে দৃষ্টি মিলাইয়া আমিও জল দেখিতেছি। তাহার পর জল কখন চোখ হইতে মিলাইয়া গিয়াছে—বাধাহীন অশরীরী বেগ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িতেছে না।

বাসন্তীকে এত কাছে রাখিয়াও নিজেকে এই নদীর মতো অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হইতে লাগিল। আগে তবু এখানে-সেখানে কয়েকখানা নৌকা দেখা যাইত, ছইয়ের তলায় বসিয়া মাঝিদের রান্না ও গল্প-গুজবের শব্দ কানে আসিলে কতকটা যেন নিশ্চিন্ত বোধ করিতাম। সামনের রাস্তাটা ভাঙিয়া গেছে বলিয়া একটা গরুর গাড়ির চাকার শব্দও আর শুনিতে পাই না। সব যেন বিরাট গতির ঘূর্ণিতে পড়িয়া কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে!

একটা শকুন অন্ধকারে পাখার শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল। সচেতন হইয়া চাহিয়া দেখি বাসন্তীও কেমন অসাড়, উদাসীন হইয়া বসিয়া আছে। উহাকে আমার যেন কেমন ভয় করিতে লাগিল। গায়ে ঠেলা দিয়া কহিলাম,—এখান থেকে উঠে চলো, নইলে এবার ভেঙে পড়বো।

বাসন্তী তবু নড়িল না। চকিতে মনে হইল, উহার চোখে মৃত্যুর স্পর্শ লাগিয়াছে, এমন স্তব্ধ-মত্ততায় তন্ময় হইতে আর কখনো উহাকে দেখি নাই। নদী যেন এখুনি উহাকে আমার বাহুবন্ধন হইতে ছিনাইয়া নিবে! আর দেরি নাই!

আমাদের ঘিরিয়া সত্য-সত্যই অনেকখানি জায়গা লইয়া চিড়

ধরিল। দুই বলিষ্ঠ হাতে মাটি হইতে উহাকে বুকের মধ্যে কাড়িয়া লইলাম। কোনোদিকে না চাহিয়া বাসন্তীকে বুকে ধরিয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া আসিলাম,—দেখি আমারই বুকের উপর কখন সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে!

অবশ ভাবটা কাটিলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—এখন কেমন লাগছে, বাসন্তী?

দুর্ব্বল হাত দুইটি দিয়া আমার গলা জড়াইয়া সে কহিল,—ভীষণ ভয় করছে। আমাকে তুমি ধরে' রাখো। আমায় ছেড়ে দিয়ো না।

আমার স্নেহ দিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া রহিলাম। কহিলাম,—কেন তোমায় ছেড়ে দেবো? কার সাধ্য তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে রাখে?

লক্ষ লক্ষ ঢেউ তুলিয়া নদী আমাদের এই গভীরতম মিলনের মুহূর্ত্তকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। যেন উদ্দাম প্রবাহে এই মুহূর্ত্তটিকে সে ভাসাইয়া নিয়া যাইবে।

তাহার পর আমাদের জীবনে সেই পরম লগ্নের আবির্ভাব হইল।

রাত অনেক হইয়াছে—অকূল আকাশ ভরিয়া জ্যোৎস্নার আর অবধি নাই। সেই পরিপূর্ণতম প্রশান্তির নিচে নদীর

এই লেলিহান উন্মত্ততার কোথাও এতটুকু সঙ্গতি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

সময় থাকিতেই ছোট খড়ের ঘরে উঠিয়া আসিয়াছি। চাকর ছোট টেবিলের উপর তেমনি বাতি জ্বালাইয়া খাট জুড়িয়া বিছানা করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু রাতে আজ গল্প লিখিবার বা ঘুমাইবার কথা ভাবিতে গেলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়!

লিখিবার খাতা ও গয়নার বাক্সটার সঙ্গে আরো কিছু খুচরা জিনিস সরাইয়া ফেলিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু শেষকালে কেন জানি না আর হাত উঠিল না। কী ফেলিয়া কী নিব, নিয়াই বা কী করিব, কোথায় রাখিব, এমনি একটা মূঢ় সন্দেহে বা বৈরাগ্যে স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তাহার চেয়ে বাসন্তীকে লইয়া মুক্তির এই উজ্জ্বল ও প্রখর উলঙ্গতা দেখিতে শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল।

লক্ষ-লক্ষ অমিত-বিক্রম শ্বেতহস্তী আমাদের বাড়িটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল—যে-বাড়িতে বাসন্তী কার্পেট ও কৌচ বিছাইয়া ড্রয়িং-রুম্ তৈরি করিয়াছিল, যে-বাড়ির ছোট একটি নিভৃত কোঠায় বসিয়া আমি যতো না লিখিয়াছি তাহার চেয়ে ভাবিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি বেশি, যে-বাড়িতে প্রকৃতির পরিবেশে পরস্পর দুই জনের নিগূঢ় রহস্য সন্ধান ও সমাধান করিয়াছি, যে-বাড়িতে বাবা মা'র অপূর্ব্ব বিচ্ছেদ-স্মৃতির স্বপ্নটি রাখিয়া গিয়াছেন।

অথচ, আকাশে যে এখন প্রচুর নির্মেঘ জ্যোৎস্না—এই

জ্যোৎস্না-রাতে আমরা দুইজনে যে সিমু-গাছের তলায় বাঁশের মাচার উপর বসিয়া কতো গল্প করিয়াছি—এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?

অসহায় চোখের সামনে বাড়িটার মৃত্যু দেখিতে লাগিলাম।

বড়ো বড়ো ছবি, কৌচ-টেবিল-চেয়ার-আলমারি, বাসন-কোসন, খেলনা-পত্র, বিম-বরগা, ইঁট-কাঠ, জান্‌লা-দরজা—সব যেন একসঙ্গে কানের কাছে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সমস্ত কিছুর যেন প্রাণ আছে, দুঃখ অনুভব করিবার তীব্র ক্ষমতা আছে—আর আছে মৃত্যুর আক্রমণে আমাদেরই মতো কঠিন পরাঙ্মুখতা। কিছুতেই আশ্রয় ছাড়িবে না, মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে, সাধ্যমতো সংগ্রাম করিবে, বাধা দিবে, আর্ত্তনাদ করিবে। সহজে হার মানিবে না। বেগের সঙ্গে বস্তুর সেই অপরূপ যুদ্ধ দেখিতে-দেখিতে সারা দেহে ভয় ও বিস্ময়ের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল।

কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে কে কবে পারিয়াছে? ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বাড়িটার আর চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না।

মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকাণ্ড একটা মুক্তির আকাশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। সমস্ত কিছু আকাশের মতো সাদা হইয়া গেছে।

সকালবেলার দিকে সরকার-মহাশয় গরুর গাড়ি ডাকিয়া আনিলেন। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা গাড়িতে বোঝাই

হইল। বাসন্তীকে লইয়া ঘুর-পথে রেল ইষ্টিশান্‌এর দিকে রওনা হইলাম।

খড়ের ঘরে সরকার মহাশয় কিছুকাল আরো থাকিবেন ও বর্ষার শেষেও যদি পূবদিকের চর মাথা চাড়া দিয়া না উঠে, তবে একদিন বাড়ির দিকে রওনা হইলেই চলিবে।

ট্রেনে চড়িয়া এতক্ষণে বাসন্তী সহজ করিয়া কথা কহিতে পারিল। আমরা কলিকাতায়ই যে যাইতেছি ও আশ্রয় ভিক্ষা করিতে যে বাগবাজারে তাহার বাপের বাড়িতে গিয়া উঠিব না, ইহাতে সে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত বোধ করিল। তাহার বাবা যে আমাদের এই পরাজয়ের লজ্জাকে সগৌরবে ব্যঙ্গ করিবেন, আমার স্ত্রী হইয়া তাহা তাহার অসহ্য।

বলিতে কি, মামার কাছে গিয়াও হাত পাতিলাম না। কালিঘাটের অঞ্চলে একটা বাড়ির একতলাটা ভাড়া লইলাম। দুইখানি মাত্র ঘর—একটিতে সামান্য কয়টি রান্নার সরঞ্জাম ও অন্যটিতে মেঝের উপর মাদুর বিছানো শয্যা ছাড়া আর কোনো উপকরণ নাই। দেয়ালে একটিমাত্র ল্যাম্প জ্বলে ও গল্প লিখিবার কথা মনে না আনিয়া সেই আলোতে বসিয়া কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া-দেখিয়া দরখাস্ত লিখি।

নদী-স্রোতের মতো সময়ও উত্তাল বেগে সমানে আগাইয়া আসিতেছে।

একটা ছোটখাটো চাকরি জোগাড় করিয়াছি—নিজেরই একার চেষ্টায়। সেই অহঙ্কারে কিছু দরকারি জিনিস-পত্র

কিনিবার ইচ্ছা হইল। বউবাজারে কোথায় খুব সস্তায় নিলাম হইতেছে—চার টাকা দিলে অনায়াসে ঘরে একখানা করিয়া টেবিল ও চেয়ার আসে। কথাটা ভয়ে-ভয়ে বাসন্তীর কাছে উত্থাপন করিলাম। বাসন্তী ম্লান হইয়া হাসিয়া কহিল,—ভাড়াটে বাড়ি, কখন উঠে যেতে হয় ঠিক নেই, জিনিসপত্র কাঁধে করে কোথায় ঘুরে বেড়াবে? এই বেশ আছি।

টেবিল-চেয়ার আর কেনা হইল না। চার টাকা দিয়া ঠিকে একটা ঝি রাখিলে বরং কাজ দিবে।

ভাড়াটে বাড়ি! কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তীরের বন্ধন হইতে নদী আমাদের বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে লইয়া আসিয়াছে।

নদী আমাদের বাড়ি ভাঙিয়াছে, কিন্তু সময়ের স্রোত আমাকে ও বাসন্তীকে ধীরে-ধীরে জীর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল।

গেল সোমবার হইতে ছোট খোকাটার জ্বর—ডাক্তার একজন ডাকিয়া আনিলে হয়। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে যদি সারে, মিছামিছি কয়েকটা টাকা খরচ করিয়া এমন আর বিশেষ কী লাভ হইবে? আরো কয়েকদিন যাক্।

ঝি-র সঙ্গে বাসন্তী নিতান্ত খেলো সহুরে ভাষায় ঝগড়া করিতেছে। উনুনের ধোঁয়ায় ঘর-দুয়ার সব আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কে যেন কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ঝি-কে তাড়াইবার জন্য তাগিদ দিতে বাসন্তী আসিল, না, বাকি মাসের মাহিনা লইয়া বিদায় হইতে ঝি আসিল, সহসা বুঝিতে পারিলাম না।

আপিসে যাইবার জামাটা বাসন্তীকে কত দিন সেলাই করিয়া

রাখিতে বলিয়াছি, তাহাতে তাহার গ্রাহ্য নাই। রোদে তোষক মেলিবার জায়গা নাই বলিয়া ছারপোকার কামড়ে রাত্রে একটু ভালো করিয়া ঘুমাইতেও পারি না। চাহিয়া-চিন্তিয়া তাজমহলের ছবিওয়ালা সুন্দর একটা ক্যালেণ্ডার আনিয়া দেয়ালে টাঙাইয়া রাখিয়াছিলাম, দুরন্ত ছেলে দুইটা কাড়াকাড়ি করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছে।

নদীর হাত হইতে রক্ষা পাইলেও সময়ের হাতে আমাদের আর নিস্তার নাই।

শুনিতেছি আপিসে কর্ম্মচারীদের ছাঁট সুরু হইয়াছে। আমি এখনো কোনো রকমে টিঁকিয়া আছি—তবে বলা যায় না। নদী আমাদের বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে লইয়া আসিয়াছে।

তবু রাশি-রাশি ফেনিল জলের থেকে এ অনেক ভালো। টাইম্‌পিস্ ঘড়িটির মতো হৃৎপিণ্ড মৃদু-মৃদু ধুক্-ধুক্ করিতেছে—কোনো রকমে যে নিশ্বাস নিতেছি এই একরকম ভালো লাগিতেছে। তীব্র সুখের মধ্যে এই যে, শত দারিদ্র্যেও শ্বশুরের কাছে গিয়া হাত পাতি নাই—ব্যোমকেশের সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকেই না-হয় আরেকবার মামার পিপুলের দোকানে পাঠাইয়া দিব। সে না-জানি এখন কী করিতেছে!

ছোট গল্প

৷

প্রকাশক ফাইল্-কপিটা অন্যমনস্কের মতো হাতে নিয়ে নির্লিপ্ত গলায় বল্লেন,—কী এগুলো? ছোট গল্প? ও! আপনিই নিরঞ্জন দত্ত? বসুন, বসুন।

নিরঞ্জন সামনের বেঞ্চিতে কুণ্ঠিত হ'য়ে বস্লো।

প্রকাশক গল্পের পৃষ্ঠাগুলি উল্টোতে-উল্টোতে বল্লেন,— ছোট গল্পের বই বাংলা দেশে চলে না, মশাই। ছোট গল্প হচ্ছে মাসিক পত্রিকার জন্যে। আপনার কাছে কোনো উপন্যাস নেই?

নিরঞ্জন বিমর্ষ হ'য়ে বল্লে,—না। গল্পগুলো আগে নিন্, পরে না-হয় একটা উপন্যাস লিখে দেব।

প্রকাশক একটু হাস্লেন। ফাইল-কপিগুলো চওড়া ম্যানিলা-খামের মধ্যে পুরে' রাখতে-রাখতে বল্লেন,—গল্পের বই দু'একখানা বা'র করে' দেখেছি মশাই, আদপেই কাটতে চায় না। লোকে উপন্যাস ভেবে গোড়ায় কেনে দু' একখানা, কিন্তু দু'চার পৃষ্ঠা উল্টে গল্প বলে' টের পেয়েই ফেরৎ দিয়ে যায়।

নিরঞ্জন সকাতরে প্রকাশকের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে,— গল্পের বইকে লোকে উপন্যাস ভেবে কিনবে কেন? গল্প বলে'ই কিনবে।

—তা হ'লে আর দুঃখ ছিলো না। প্রকাশক দু' আঙুলে গোঁফ টানতে-টানতে বল্লেন,—গল্প, মশাই, দু' পাতা উল্টোলেই ফুরিয়ে যায়—পাঠকের দাম ওঠে না। কিন্তু ব্যবসা করতে বসে' এক-আধটু না ঠকালে চলবে কেন? ঠকানো কথাটা হয়তো খারাপ শোনাবে, কিন্তু একটু ছল-চাতুরী করে' যদি গল্পের বই গছানো যায়-ই, তো মন্দ কী! জোর-জবরদস্তিই বলুন, বা জুয়াচুরিই বলুন, এই করে'ই যদি পাঠকের মধ্যে ছোট গল্প সম্বন্ধে খানিকটা রুচিগঠন করা যায়! তা না হ'লে তো আর কোনো উপায় দেখছি না।

আবহাওয়াটা সামান্য একটু ঘন হ'য়ে এসেছে। নিজের অজান্তে নিরঞ্জন সামনের টেবিলের উপর আল্গোছে একটুখানি ঝুঁকে পড়লো। বল্লো: কী করে' সেটা হয়?

গম্ভীর, জ্ঞানীর মতো মুখ করে' প্রকাশক হাসলেন। বল্লেন, —তা আছে। ধরুন, বিজ্ঞাপনে ছোট গল্প বলে' লেখা চলবে না।

—তবে? নিরঞ্জন প্রায় চম্‌কে উঠলো: বেমালুম উপন্যাস বলে' চালাতে হ'বে?

—তা-ও না। একেবারে নীরব থাকবো। কিম্বা খুব general term ব্যবহার করলেই হ'লো। টেক্‌নিক্যালি কেউ নালিশ করতে পারবে না। ধরুন, যদি আপনার বই নিই, তবে সোজাসুজি বিজ্ঞাপন দেব—নিরঞ্জন দত্তর নতুন বই: অমুক। লোকে এখন বুঝে নিক্। আর মফঃস্বলে অর্ডারি বই একবার চলে' গেলে সচরাচর ছোট গল্পের অজুহাতে ফেরৎ আসে না। সে

অনেক হাঙ্গাম। মুস্কিল হয় এই সব লোক্যাল্ খদ্দেরদের নিয়ে। প্রকাশকের মুখের রেখাগুলি বিরক্তিতে রুক্ষ হ'য়ে উঠলো।

নিরঞ্জন নিজের অজান্‌তে আবার কখন টেবিলের থেকে সরে' গেছে। পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে অলক্ষ্যে ঘাম মুছতে-মুছতে সে বললে,—তাদের জন্যে কোনো ব্যবস্থা নেই ?

—আছে বৈ কি, তা-ও আছে। প্রকাশক তেমনি গোঁফ টানতে-টানতে বললেন,—কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। প্রথমতো, গল্পের বইয়ে আমরা সূচীপত্র দিই না, দু'দিকের পৃষ্ঠার মাথায় আগাগোড়া বইয়ের নামই ছাপা থাকে—যেটা গোড়ার গল্প, তার নামেই বইর নাম—

নিরঞ্জন ব্যস্ত হ'য়ে বললে,—কিন্তু যেখানে নতুন গল্প সুরু হ'বে ?

গোঁফ ছেড়ে দু'আঙুলে টেবিলের উপর এক বাড়ি দিয়ে প্রকাশক বললেন,—সেইখানেই তো যতো গোলমাল। অল্প একটু 'সিঙ্ক' দিয়ে আরম্ভ করি বটে, যদ্দুর সম্ভব সেটুকুন ফাঁক লুকিয়ে রাখতে চাই, কিন্তু যারা প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা উল্‌টে' বই কিনবে, মশাই, তাদের চোখে ধুলো দিই কী করে' ? সে জন্যেই তো ছোট গল্পের ধার দিয়েও যেতে চাই না।

সমস্ত শরীরে দুর্ব্বল একটা ভঙ্গি করে', মিন্‌মিনে গলায় নিরঞ্জন বললে,—কিন্তু দু' একখানা গল্পের বই তো আপনি ছেপেছেন।

প্রকাশক প্রায় ধম্‌কে উঠলেন : সে-সব বই দপ্তরির বাড়িতে

পোকায় কাটছে। ঘরের খেয়ে কতো আর বনের মোষ তাড়াবো বলুন। উপন্যাস নিয়ে আসুন, কথাটি কইবো না। খদ্দেররাও ভাববে তাদের টাকা উসুল হ'লো। নিশ্চিন্ত হ'য়ে মুখ খুলে তখন ব্যবসা করা চলে। নইলে সব সময় এ লুকোছাপা করতে বিরক্তি ধরে' যায়। পয়সা দিয়ে বই ছাপবো, অথচ বিক্রি করতে পারবো না—এ কী ঝকমারি!

নিতান্ত অসহায়ের মতো নিরঞ্জন বল্লে,—কিন্তু হাতে তো আমার উপন্যাস নেই। লেখা একটা হ'লেই আপনাকে দেবো—প্রমিস্ করছি।

খামটা নিরঞ্জনের দিকে ঠেলে দিয়ে প্রকাশক বল্লেন,—তখনই একেবারে আসবেন না-হয়। দু'টি দিন সবুর করুন না।

—দু'টি দিনো যে সবুর করতে পারি না। নিরঞ্জনের গলা প্রায় আট্‌কে আসতে লাগলো: টাকার ভীষণ দরকার। হাতে কিছু টাকা এলে পর নিশ্চিন্ত হ'য়ে কোনো বড়ো জিনিসে হাত দিতে পারি।

জীবনের সব চেয়ে মহত্তম দার্শনিক বাণী করছেন এমনি গম্ভীর গলায় প্রকাশক বল্লেন,—সংসারে টাকার কা'র দরকার নয় শুনি? আপনারা কবি-মানুষ, আপনাদের মলয় হাওয়া খেলেই চলে, মাটির ওপর বসে' আপনারা আকাশের স্বপ্ন দেখেই দিন কাটান্—আপনাদের দুঃখ কী!

উত্তরে কি-কথা বল্‌বার জন্যে নিরঞ্জনের গলা খুসখুস করে' উঠ্‌লো। কিন্তু কতো কথা বিবৃত করলে তবে তার যথার্থ উত্তর

দেয়া হ'বে এক নিমেষে সে তা ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারলো না। অতো কথা বলবার সময় নেই, বলতে গেলে সাহিত্যিকের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'বে, টাকার গদিতে বসে' প্রকাশক তার এক কণাও বিশ্বাস করবেন না। নিরঞ্জন চুপ করে' রইলো, চুপ করে' তার ডান হাতের নোখগুলি টেবিলের বনাতের উপর ঘসতে লাগলো।

প্রকাশক আবার মুখ খুললেন: টাকার যে ভীষণ দরকার বলছেন, গল্পের বইয়ে কতো আর আপনি পাবেন শুনি?

নিরঞ্জন দূর-দিগন্তে মরীচিকার ক্ষীণ আভাস দেখতে পেলো। চেয়ারের মধ্যে একটু নড়ে'-চড়ে' লাজুক গলায় বল্‌লে,—পাওয়া-থোওয়ার কথা পরে। আগে গল্পগুলি আপনি একবার পড়ে' দেখুন।

যেন একথোকে কতোগুলি টাকা পাবার তার সমূহ দরকার নেই—কথাটা খানিক তেমনি শোনালো, না? কিম্বা গল্পগুলি পড়ে' প্রকাশক এমনি বিচলিত হ'বেন, যেন পাওয়া-থোওয়ার বিষয় বিশেষ কিছু আর ভাবতেই হ'বে না!

ও-কথার পিঠে প্রকাশক কী বলেন, শোন্‌বার জন্যে নিরঞ্জন সমস্ত শরীরে কান পেতে রইলো। কিন্তু শেষ মোক্ষম কথাটা বলে' নেবার আগেই দেখতে-দেখতে প্রকাশক অন্য কাজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। এক খদ্দেরকে গোপনে ডিস্‌কাউন্ট দেয়ার হিসেব নিয়ে হঠাৎ তাঁর এক কর্ম্মচারীর সঙ্গে তুমুল বচসা সুরু হ'য়ে গেলো। ব্যাপারটা ঠিক বচসা নয়, একতরফা কটু-কাটব্য।

রাগে প্রকাশক প্রায় তোত্‌লাতে সুরু করেছেন, এবং এই মুহূর্ত্তে যে তিনি কর্ম্মচারীটিকে তাড়িয়ে দিতে পারেন সে-সম্বন্ধেও সমানে তাঁর শাসানো চলছে। সহসা সমস্ত সুর নিবে গেলো, আবহাওয়া গেলো ছিঁড়ে, ফেঁসে, টুকরো-টুকরো হ'য়ে। নিরঞ্জনের শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সুতো গুটোতে-গুটোতে ঘুড়ি সে প্রায় হাতের কাছে নিয়ে এসেছিলো, এমনি সময় কিনা কাটা গেলো। পারের কাছে নৌকো ডোবা-র কথা সেও উপমা-হিসেবে কাগজে-কলমে ব্যবহার করেছে নিশ্চয়, কিন্তু কথাটার ব্যাপ্ত্যর্থ সে এতোদিনে হৃদয়ঙ্গম করলে। তা হ'লে এইখানেই যবনিকা পড়লো। এইবার উঠতে হয়।

তবু তার সমস্ত শরীর আমতা-আমতা করতে লাগলো। উঠতে হয় বললেই আর ওঠা যায় নাকি? তবু আরো দু' মিনিট বসে' থাক্‌লে আরো একটু দুরাশা করা যায়। জীবনে দুরাশা এক মহান উত্তেজনা। সাহিত্যিকের বাঁচবার পক্ষে তা-ই হচ্ছে 'এলিক্সার'।

হঠাৎ গলায় কি-একটা মোচড় দিয়ে প্রকাশক স্বরটা একেবারে খাদে নামিয়ে আনলেন: আচ্ছা, গল্পগুলি রেখে যান্, একবার না হয় পড়ে' দেখি।

নিরঞ্জন এবার উঠে পড়বার একটা ক্ষিপ্র ভঙ্গি করলে। হ্যাঁ, এখুনি উঠে পড়া উচিত। মাছ ডাঙায় তোলবার আগে যেমন তাকে খানিকক্ষণ খেলাতে হয়, তেমনি প্রকাশকের মুখের ঐ কথাটাকে কয়েকদিন তার মনের মধ্যে জীইয়ে রাখতে

হ'বে। এখুনি না উঠে পড়লে আবার হয়তো কোথা দিয়ে কী গোলমাল বেধে যাবে ঠিক নেই। কেউ এসে এখন প্রকাশকের সামনে একখানা বিল মেলে ধরলেই তো হয়েছে! সমস্ত রক্ত তাঁর মাথায় উঠে যাবে এবং সেই মুহূর্ত্তে তাঁর কাছে শব্দগন্ধ-স্পর্শময়ী পৃথিবী হ'য়ে উঠবে অন্ধকার। এবং সেই মুহূর্ত্তে তার গল্পগুলি—নিরঞ্জন আনুপূর্ব্বিক কিছু ভাবতে পারলো না।

সানন্দ অথচ লজ্জমান মুখভঙ্গি করে' নিরঞ্জন বল্লে,—আচ্ছা। এবার তবে উঠি। গল্পগুলি আপনার ভালোই লাগবে। অনেকেই নানা দিক থেকে নানা রকম প্রশংসা করেছেন। হ্যাঁ, ছ'টা আছে—যদি আরো দু' একটা লাগে, দিয়ে যাবো। বলে' খামটা সে প্রকাশকের আরো একটু সামনে ঠেলে দিয়ে উঠে পড়লো।

প্রকাশক নির্লিপ্ত গলায় বল্লেন,—বইয়ের ভালো-মন্দয় আমাদের কিছু এসে যায় না। বই যা কাটে মশাই, তা কেবল লেখকের নামে। আমরা ব্যবসা করতে বসেছি, সাহিত্য করতে বসিনি।

নিরঞ্জন মুখভাব সৌম্য, প্রশান্ত করে' সম্মতির হাসি হাস্লো: তা তো ঠিকই।

কথাটার মাঝে গূঢ়তম বিদ্রূপেরো আভাস রইলো না। সহজ, সম্পূর্ণ সম্মতি। যেন ঐটেই হচ্ছে প্রকাশকদের প্রধানতম মর্য্যাদা।

ভীরু, আহত গলায় নিরঞ্জন জিগ্‌গেস করলে: কবে আবার আস্‌বো?

রুদ্রের আবির্ভাব

—এই এক সপ্তাহ বাদে। পারেন যদি তো একটা উপন্যাস নিয়ে আসবেন।

এক সপ্তাহ বাদে ফের আসতে পারা যাবে—তাই যথেষ্ট। পরের কথাটায় কান না দিয়ে নিরঞ্জন বেরিয়ে পড়লো। তার গল্পগুলি প্রকাশকের টেবিলের উপর অনেক-সব কাগজ পত্রের পাশে পড়ে' রইলো : ওদের যত্ন করে' ড্রয়ারের মধ্যে গুছিয়ে রাখবার কথা বলে' এলে হ'তো—হারিয়ে গেলে আবার তাদের পুনরুদ্ধার করা দুঃসাধ্য হ'বে। না, সে জন্যে চিন্তা করবার দরকার নেই—প্রকাশক তেমন কাঁচা ব্যবসাদার নয়।

বদ্ধ বোতলের জলে রঙিন মাছের মতো নিরঞ্জনের মন হাল্কা সুখে খেলে বেড়াতে লাগলো। গল্পের বইর দাম সম্বন্ধে কথা পাড়া, তার এরি মধ্যে বাজারে একটু নাম হয়েছে এমনি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করা, এক সপ্তাহ বাদে ফের তাকে আস্‌তে বলা, সব মিলিয়ে ব্যাপারটা তার কাছে আশাপ্রদ বলে'ই মনে হ'লো। তবু যা হোক্ এই প্রকাশক তাকে বসতে বলেছে, নাম শুনে প্রথমটা একটু আপ্যায়িত হ'বার ভাণ করেছে ও মুখের উপর একেবারে তাকে 'এখানে হবে না' বলে' বিদায় করে নি। ছোট গল্প শুনে সবাই এক বাক্যে বলেছে : 'মাপ করবেন।' কথাটা নিরঞ্জনের কানে শুনিয়েছে যেন খানিকটা ভিক্ষুককে বিতাড়িত করবার সহজ, নিষ্ঠুর, নির্ব্বিকার তিরস্কারের মতো। তবু যা হোক্ এতোক্ষণে নিরঞ্জন টের পেলো কী কৌশলে গল্পের

বইকে সাহিত্যের হাটে পাঙ্‌ক্তেয় করা যায়। কী কৌশলে শুদ্ধি করে' তার অস্পৃশ্যতা দূর করতে হয়!

'হ্যাঁ, নাম তার কিছু হয়েছে বটে। ট্র্যামে-বাস্‌এ পেছনের সিট্‌এ বসে' দু' বন্ধুতে তার নাম করে' বলাবলি করে; কখনো কা'দের সাম্‌নে গিয়ে পড়লে তারা বাক্যালাপ বন্ধ করে' তার মুখের দিকে অনাবশ্যক গম্ভীর হ'য়ে তাকায়—স্পষ্ট বোঝা যায় তারা তাকে চিন্‌তে পেরেছে; কখনো একজন আরেক জনকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয়: এই নিরঞ্জন দত্ত! তারপর দূর গ্রাম ও সহর থেকে তার অজানা ভক্তরা মাঝে-মাঝে তাকে চিঠি লেখে। অনেক তাদের প্রশ্ন ও প্রশংসা। কেউ বা জিগ্‌গেস করে: আপনার কখন লেখা আসে—রাত্রে না দুপুরে, শীতে না বর্ষায়? কেউ বা কোনো চরিত্রের বিশেষ পরিণতির যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে: তার বিয়ে না দিয়ে কেন আপনি ওখানে গল্পের শেষ করলেন? কেউ বা সরাসরি তার জীবনের এক পৃষ্ঠা লিখে পাঠিয়ে তাকে গল্পে ফাঁপিয়ে তোলবার জন্যে ফরমাজ করে। সে সব অনেক চিঠি। টিকিটের অভাবে সবগুলির সে জবাব লিখতে পারে না—ভক্তরা নিশ্চই ভুল বোঝে, ভাবে অহঙ্কারী। কেউ গায়ে পড়ে' আলাপ করতে এলে সত্যই সে কুণ্ঠিত হয়—তার পোষাকের দারিদ্র্যে, তার মেক্‌-আপ্‌এর রূঢ়, অনাবৃত অসাহিত্যিকতায়। শুধু নামের নির্মোকের মাঝেই তাই তার আত্মগোপন করে' থাকতে হয়। নাম যে তার হয়েছে তার বহু প্রমাণ এখানে-সেখানে তার চোখে পড়ে। মাসিক-পত্রিকার

সম্পাদকরা তার গল্প চেয়ে পাঠায়, বাড়িতে প্রুফ পৌঁছে দেয়, ছাপা হ'বার আগেই কোথাও-কোথাও 'পারিশ্রমিক' মেলে, পারিশ্রমিক ধার্য্য হয় ঠিক পৃষ্ঠা-সংখ্যার উপর, অক্ষর-সন্নিবেশের উপর, মাত্র লিপিবদ্ধতার শারীরিক ব্যায়ামের উপর। সেখানে আর কোনো মানদণ্ড নেই, তৌলে অক্ষর মেপে তার মূল্যনির্ণয়। তা হোক্, তবু টাকাটা তো হাতে আসে—কিছু স্থিতিমান পদার্থের তো সত্ত-সত্ত সন্ধান মেলে। নাম না হ'লে তো তাকে এতোদিন কেবল ছাপা হওয়ায় বিনিময়েই তৃপ্ত থাকতে হ'তো। তার রচিত অক্ষরগুলি যে কম্পোজিটাররা দয়া করে' পর-পর নির্ভুল সাজিয়ে দিয়েছে তাতেই তো তার কৃতার্থ, বাধিত থাকা উচিত। সেই বাধিত থাকার যুগ সে অনেক সাধনায় পেরিয়ে এসেছে। নাম হয়েছে বলে'ই পরবর্ত্তী সংখ্যায় তার লেখা ছাপা হ'বে বলে' বিজ্ঞাপন বেরোয়; নাম হয়েছে বলে'ই বিপক্ষীয় শত্রুরা গালাগাল করবার জন্যে চাঁদা করে' কাগজ বা'র করে, কেচ্ছা করবার মতলবে স্পাই রাখে, হেয় করবার জন্যে মনগড়া কলঙ্ক রটায়, পুলিশ লেলিয়ে দেয়। নাম না হ'লে সাহিত্যিকের কখনো সমালোচক জোটে না, আর সে-সমালোচনা এতো মুখর, এতো প্রবল, এতো ধারাবাহিক হ'য়ে ওঠে না। হ্যাঁ, নাম তার যে হয়েছে তাতে সন্দেহ কী। নিন্দা শুনে যারা তার লেখা পড়তে প্রবৃত্ত হয়, তারাই পড়া শেষ করে' তাকে স্তুতি করে' পাঠায়। নাম হয়েছে বলে'ই সমালোচনার নামে বিনা-দামে সে অতো বড়ো একটা বিজ্ঞাপন পেয়ে আসছে।

কিন্তু ঐ নাম-মাত্র।

নিরঞ্জন একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লো। আসন্ন কৃতকার্য্যতার মোহে সামান্য একটু তার অপব্যয় করতে ইচ্ছে করছে। হ্যাঁ, অমন চুটকি গল্প না লিখে একটা ফুল-ড্রেস্ টিপ্-টপ্ উপন্যাস লিখতে পারলে হ'তো বটে, তা হ'লে হয় তো বেগ পেতে হ'তো না—কিন্তু অতো তার সময় কোথায়? উপন্যাস একবার সুরু করলে এক সুরে তো তাকে শেষ করতে হ'বে—অতো দিন সে খাবে কী? উপন্যাসের আবহাওয়ায় ছোট গল্প বাড়তে পারে না, পরিচ্ছেদগুলি তা হ'লে খণ্ড-খণ্ড হ'য়ে খসে' পড়তে থাকবে। উপন্যাস লিখতে হ'লে সময়ের উপর জমিদারি চাই। অতো দীর্ঘ দিন নিরঞ্জন অপেক্ষা করতে পারে না, মাস ফুরোলে তাকে বাড়ি-ভাড়ার টাকা গুনতে হয়; আকাশে যখন নতুন চাঁদ ওঠে, তখন সে বিছানায় শুয়ে মনে-মনে পরের দিনের বাজারের বাজেট্ তৈরি করে। রাশি-রাশি খুচরো গল্প না লিখে দিনের চাহিদা সে কী করে' মেটায়!

কিন্তু গল্পগুলিকে বইয়ের আকারে ছাপতে গিয়ে ঐ ভাবে তাদের গল্পত্ব গোপন করতে হ'বে ভাবতে তার মুখের চা তেতো হ'য়ে উঠলো। বাঙলা দেশের পাঠকরা গল্প চায় না, তার চায় পূর্ণায়তন, পরস্পরসংলগ্নপৃষ্ঠা একটানা উপন্যাস। যতো দেরি করে' ফুরোবে ততোই তার শ্রেষ্ঠত্ব। তারা লেখার দাম চায় না, তারা চায় তাদের পয়সার দাম। প্রতিটি পৃষ্ঠা তারা যাচাই করে' নেবে, তার লাইন গুনে, তার

'এম্' মেপে। তারা চায় ঘটনার পর ঘটনা, অনিশ্চয়তার পর অনিশ্চয়তা, তারা চায় আরম্ভ থেকে শেষ পরিপূর্ত্তি। সব জিনিস তাদের স্পষ্ট করে' চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হ'বে, তাদের বুঝে নেয়ার জন্যে ছেড়ে দিলে চলবে না। তাই তারা ঘন, ক্ষীণায়ু, সঙ্কেতসঙ্কুল গল্প চায় না, তারা চায় বহুবিসর্পিত, বহুবিবৃত, বিশদীকৃত উপন্যাস। তারা তাদের পয়সা সুদে-আসলে উসুল করে' নেবে।

নাটক দেখতে এসে যারা সমস্ত রাত জেগে সমস্ত রসের জগা-খিচুড়ি পেতে চায়, তারাই উপন্যাসে চায় এমনি সময়ের অমিতব্যয়। যে-রস দ্রুত জীর্ণ হয়, তাতেই তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাহত থাকে, তারা চায় সাহিত্যকে চিবিয়ে-চিবিয়ে হজম করতে। তারা চায় সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে একটা স্থূল সীমা, সঙ্কেতের অনন্ত অসম্পূর্ণতায় তারা ওঠে হাঁপিয়ে। তাই ক্রেতা-পাঠকরা কবিতা ও ছোট গল্পকে মাসিক-পত্রিকার পৃষ্ঠায় যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত করে' রেখেছে।

কিন্তু পয়সার জন্যে ছোট গল্পকে তার স্বকীয়তা বর্জ্জন করতে হ'বে এই দুঃখই বা সে সয় কী করে'? এমন সম্বল নেই যে নিজে ছেপে বা'র করে, এমন সম্বল নেই যে তার ফেরা-ফিরতি প্রাপ্তির জন্যে সে প্রতীক্ষা করে' বসে' থাকে। আর ছোট গল্প ছাড়া হাতে তার কিছু নেইও! ছোট গল্প—ক্ষণিকতায়ই যা অবিনশ্বর, দ্রুত সমাপ্তিতেই যা অসীম ব্যঞ্জনাময়—বাঙলা দেশে তার দাম নেই। একটি

জীবনের ক্ষুদ্র মুহূর্ত, এবং সেই মুহূর্তের পরিপূর্ণ জীবন—এই ছোট গল্পের কোনো মর্য্যাদা নেই। ছোট গল্প হচ্ছে সাহিত্যিক **cameo**, যেখানে প্রখর আলোয় জীবনের অবহেলিত অদৃশ্য দিকটা ধরা পড়ে, যেখানে কেবল আবিষ্কারের বিস্ময়, কৌতূহলের চঞ্চলতা। বাঙলা দেশের পাঠকের কাছে ছোট গল্প আর দৈনিক খবরের মধ্যে বিশেষ কোনো তারতম্য নেই। একটা লোক লটারিতে কুড়ি হাজার টাকা পেয়েছে, এই খবর ও সে কী করে' সেই কুড়ি হাজার টাকা খরচ করলো বা খোয়ালো, সেই ছোট গল্পের মধ্যে তারা কোনো তফাৎ দেখতে চায় না। টাকা পাওয়ার মোটামুটি খবরের চাইতে সেই টাকা ব্যয় করবার ছোট গল্পটা কতো বেশি কৌতূহলোদ্দীপক ; কিন্তু কল্পনাকে তারা কেউ খাটাতে চায় না, মোটামুটি খবর পেলেই তারা খুসি। এবং কল্পনার চাইতে সামান্য ঘটনার তারা বেশি দাম দেয়।

সেই ছোটগল্প—দুরবগাহ কল্পনা-সমুদ্রের ছোট-ছোট মুক্তো, সৃষ্টির আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রবিন্দু—তাদের স্বাতন্ত্র্য-গৌরব তাকে নিজ হাতে নষ্ট করে' দিতে হ'বে। এবং তা পয়সার জন্যে, শারীরিক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে। একসঙ্গে কিছু থোক টাকা তার চাই। বিয়ে করার পর এক বছরের মধ্যেই সে একটা লাইফ্-ইন্সিয়োর করেছে, মাস খানেকের ভেতরেই তাকে দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক প্রিমিয়াম দিতে হ'বে, মাস খানেকের মধ্যে দিতে না পারলেই 'পিরিয়ড্ অফ্ গ্রেস্' পার হ'য়ে

যাবে। তারপর, নিরঞ্জনের মৃত্যু ঘটলে মলিনা সংসারে আর চোখে-মুখে পথ পাবে না। না, টাকা তার চাই—কিছু বেশি টাকা হাতে এলে গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত দু'-একটা দরকারি জিনিস সে কিনতে পারে। একটা ফাউণ্টেন-পেন্‌এর অভাবে সে প্রায় মারা গেলো। মলিনার জন্মদিনে একখানা দিশি মিলের রঙিন সাড়ি কিনে দিতে পারলে খুব ভালো হ'তো।

তার পর সপ্তাহ ঘুরে নির্দিষ্ট দিনের শুভাগমন হ'লো। কিছু হ'বে না—এমনি একটা উদাসীন, দার্শনিক মনোভাব নিয়েই নিরঞ্জন রওনা হ'লো বটে--কিন্তু বাস্‌এ উঠে ভাড়া দেবার সময় ভাষায় ও ভাবে সাহিত্যিক দূরত্ব না রেখে নিতান্ত সরল, সহজ মনে প্রার্থনা করে' উঠলো যেন গ্রহ-নক্ষত্রের কোনো ফিকির-ফন্দিতে কয়েকটা টাকা তার হাতে এসে প'ড়ে।

প্রকাশক তার মুখের দিকে চেয়েও দেখলেন না,—নিরঞ্জন বেঞ্চির এক কোণে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে বসে' পড়লো। দোকানে এখন বিস্তর ভিড়, টাকা বাজিয়ে নিতে ও ক্যাশ-মেমো লিখতে প্রকাশক এখন ভীষণ ব্যস্ত। কতোক্ষণে যে ভিড়টা পাৎলা হ'বে, কতোক্ষণে যে আবার দিঙ্মণ্ডল প্রসন্ন ও বায়ু পাংশুবিবিক্ত হ'য়ে উঠবে, তারই আশায় নিরঞ্জন ঘামতে লাগলো।

কিন্তু প্রকাশক কিছুতেই তার দিকে চোখ ফেরাচ্ছেন না, তাঁর উপস্থিতিতে সঙ্কীর্ণ ঘরের খানিকটা আলো যে খোয়া গেছে সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। কিন্তু সারাদিন ধরে' তাঁকে আর কতো একতরফা ব্যবসা করতে দেয়া যায়!

গলা খাঁখ্‌রে নিরঞ্জন বল্‌লে,—আমার গল্পগুলো পড়েছেন?

স্বর শুনেও, প্রকাশকের চোখ চেয়ে বক্তাকে দেখতে হ'লো না। টাকার ধারগুলিতে আঙুল ঘুরিয়ে তাদের চলমানতা নির্ণয় করতে-করতে তিনি বল্‌লেন,—না, পড়বার সময় পেলুম কোথায়? দু'-একটু চোখ বুলিয়ে নিয়েছি। তা, আপনার কাজ কী বলুন, একটু বসুন না।

নাগরদোলাটা তলিয়ে গিয়ে আবার উঁচুয় উঠেছে। না, তার আর কাজ কী! একটু না-হয় সে বসছে। এতো লোকের সামনে লেখার দর নিয়ে কষাকষি করলে সত্যিই তার লজ্জা করবে। তার চেয়ে ভিড়ের ভদ্রতাটা একটু কমুক।

কতোক্ষণ বাদে প্রকাশক নিজেই কথা পাড়লেন: হ্যাঁ, পড়লুম বটে, কিন্তু তেমন মশাই, পছন্দ হ'লো না।

শুকনো জিভে নিরঞ্জন বল্‌লে,—কেন, আপনার কী মনে হচ্ছে?

—কেমন যেন জোলো, নিরিমিষ মনে হচ্ছিলো। প্রকাশক অর্থবান হাসি হাসলেন: ঘরোয়া সাধারণ জীবনের কথা, তা নিয়ে লোকে কী করবে? তা তো হাটে-মাঠে-ঘাটে অহরহই সবাই দেখতে পাচ্ছে। ওতে মশাই, রস কোথায়?

নিরঞ্জন সুতো একেবারে ছেড়ে দেয় নি। বল্‌লে,—কিন্তু সবগুলিই কি তাই আপনার মনে হ'লো?

—না, না, সব আর পড়তে পারলুম কই? দু'-একটা দেখেই আমরা লেখকের ধাঁচ বুঝতে পারি। আমি মশাই, এ বিশ বৎসর সমানে লেখা ঘাঁটছি, গল্পের লাইন দশেক পড়ে'ই তার শেষ বলে' দিতে পারি, কষ্ট করে' সবটা পড়তে হয় না। প্রকাশক গোঁফ টানতে-টানতে বল্‌লেন,—এই দুঃখ-কষ্টের দিনে লোকে একটু রঙিন রোমান্স্ না পেলে পয়সা দিতে চাইবে কেন? রাতের পর রাত বায়স্কোপে এতো ভিড় হয় কেন বুঝতে পারেন না?

টেবিলের বনাতের উপর নখ ঘসতে-ঘসতে নিরঞ্জন বললে, —কিন্তু আপনিই তো বলছিলেন গল্পের ভালো-মন্দে কিছু যায় আসে না, কেবল লেখকের নামটার ওপরই আপনাদের লোভ।

—তাই বলে' তো আপনি যা-তা লেখা চালাতে পারেন না। প্রকাশক রুক্ষ কণ্ঠে বল্‌লেন: ট্যাঁক থেকে খরচ করে' যখন ছাপাতে হ'বে, তখন লেখা সম্বন্ধে আমার একটা opinion থাকতে পারে তো?

—তা পারে বৈ কি, একশো বার পারে। নিরঞ্জন মুখমণ্ডল প্রশান্ত রেখেই বল্‌লে: নিশ্চয়, আপনারা এতোদিন এ-লাইনে আছেন, আপনাদের opinionএর একটা মূল্য আছে বৈ কি। নিরঞ্জন স্বরটাকে গম্ভীর, গাঢ় করে' তুললে: কিন্তু অনেকেই

এ গল্পগুলিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। দু' একজনের চিঠিও আপনাকে দেখাতে পারি।

—তারা কা'রা?

পাছে প্রকাশকের পক্ষে অমর্য্যাদাকর না শোনায়, নিরঞ্জন ভাঙা গলায় বল্‌লে,—এই আমাদের দেশেরই গণ্যমান্য সাহিত্যকেরা।

—রাখুন মশাই। প্রকাশক সতেজে টেবিল চাপড়ালেন: তারা তো বুঝে সব উল্‌টে গেছে। তারা কোনোকালে বই কেনে না মশাই, আপনার যতো ভক্তই তারা হোক্, তারা বই উপহার চেয়ে নেবে। তাদের কথা শুনলে আমাদের ব্যাবসা চলে না। আমাদের কারবার রাম-শ্যামকে নিয়ে—বিয়েতে যারা বন্ধুর বৌকে বই প্রেজেন্ট দেয়, লাইব্রেরিতে যারা মাসে-মাসে চাঁদা দিয়ে মেম্বার হয়। ও-সব বড়ো-বড়ো চাল আমার কাছে মারবেন না, বুঝলেন?

নিরঞ্জনের ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত জ্বালা করে' উঠলো। কিন্তু শক্ত করে' টেবিলের একটা কোণ চেপে ধরা ছাড়া আর কোনো জোরই সে দেখাতে পারলে না: আপনার তবে কী রকম গল্প পছন্দ?

—আমার-আপনার পছন্দ-অপছন্দে তো এসে যায় না, দেখতে হ'বে পাঠকরা চায় কী? আগের যুগের পাঠকরা হাপুস-চোখে কাঁদতে চাইতো, তাই লেখকেরাও কেবল ইনিয়ে-বিনিয়ে ককিয়ে গেছেন। আর এখনকার পাঠকরা চায় রোমাঞ্চ, রোমান্স্, পুলক-শিহরণ। আপনার এই সব নির্জ্জলা, নিষ্প্রেম গল্প তারা কিনবে কেন?

অসহায়ের মতো নিরঞ্জন তার পায়ের দিকে চেয়ে রইলো। পরে মুখ তুলে বেখাপ্পার মতো বললে,—তা'লে কী করা যেতে পারে?

প্রকাশক বল্‌লেন,—গল্পগুলি নিয়ে যান, একটু দেখে-শুনে দেবেন। অর্থাৎ কিনা, পারেন তো জায়গায়-জায়গায় একটু রঙ চড়াবেন, বুঝলেন? একেবারে আলুভাতে হ'লে চলে কি করে'? একটু গরম মশ্‌লা তো দিতে হয়! বলে' হঠাৎ তিনি গলা উঁচিয়ে হেসে উঠলেন।

নিরঞ্জন ম্রিয়মাণ হ'য়ে বসে' রইলো।

প্রকাশক টানা খুলে সেই চওড়া ম্যানিলা-খামটা নিরঞ্জনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লেন,—দেখবেন না একটু চেষ্টা করে'। ছাতে হোক্, বাস্‌এর মাথায় হোক্—বুঝলেন কিনা, দয়া করে' একাধটু প্রেম এখানে-ওখানে ছিটিয়ে দেবেন, নইলে গল্প জমবে কেন? কী বলেন?

নিরঞ্জন বল্‌লে,—ও-সব কিছু আমদানি করতে গেলে গল্পের সুর কেটে যাবে।

—দুত্তোর সুর! পাঠকরা তো ভারি সুর বোঝে! তারা তা-ই গরসে-গরসে গেলে য'তে তারা নুন আর ঝালের পরিমাণ বেশি পায়। আপনার সঙ্গে বাজা তর্ক করতে পারি না, মশাই। প্রকাশক টেবিলের ধারে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে' গোঁফ টানতে লাগলেন।

কুণ্ঠিত গলায় নিরঞ্জন বল্‌লে,—দেখবো চেষ্টা করে'।

—হ্যাঁ, আমাদের বই কাটাতে হ'বে তো। ছাপলে পাঁচ শো

ছাপবো ভাবছি। আর এমনি ভাবে খরচ করতে হ'বে—যাতে ছাপাখানায়, কাগজে, লেখকে-দপ্তরিতে, দু'শো কাপি বেচলেই টাকাটা উঠে আসে।

নিরঞ্জন না বলে' পারলো না: আর বাকি তিন শো?

—বিজ্ঞাপন নেই, মশাই? রিভিয়ুর জন্যে বই দিতে হয় না? প্রকাশক হাত ঘুরিয়ে হতাশার ভঙ্গি করে' বল্‌লেন: আপনারা আছেন কোন তালে?

ছাপবার কথা শুনে নিরঞ্জনের আশা হয়েছিলো, কিন্তু হিসেবের খসড়া দেখে হাত-মুখ তার কালিয়ে এলো। তবু সাহস করে' বল্‌লে,—আমাকে তা'লে কতো পার্সেণ্ট দেবেন?

—রেখে দিন মশাই, পার্সেণ্টেজ। ছোট গল্প নিয়ে এসে অতো বড়ো-বড়ো কথা বলবেন না। যা-হোক একটা টাকা কোনো রকমে ধরে' দিতে পারি।

—কতো?

—কতো আবার! এই গোটা পঞ্চাশ।

এতো দুঃখেও নিরঞ্জনের হাসি আসছিলো, ঢোঁক গিলে তা গিলে ফেলে সে বল্‌লে,—মোটে?

—মোটে আবার কী? ছোট গল্পে লোকে আবার কতো পায়? বাজার একবার বাজিয়ে আসুন না দেখি। নতুন লেখক—একখানাও এখনো বই বেরোয়নি, আপনার আবার হাঁক কিসের? আমি বলে'ই যা হোক্ আপনার নাম নিয়ে একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করে' দেখছি।

বাঁ হাতের আঙুলগুলি একত্র করে' তাদের নখের উপর ডান হাতের আঙুলের ডগাগুলি ঘসতে-ঘসতে নিরঞ্জন বল্‌লে,—কিন্তু অতো কম টাকায় কী করে' চলে বলুন?

—বেশ, তবে এক কাজ করুন। প্রকাশকের কথায় নিরঞ্জন চোখ বড়ো করে' তাঁর মুখের দিকে চাইলো: গল্পগুলিকে একটা উপন্যাসের চেহারা দিন। ভেক দেখিয়ে যদি ভিক্ষে পাওয়া যায়!

নিরঞ্জন অবাক হ'য়ে বল্‌লে,—তা আবার কী করে' হয়?

মৃদু হেসে প্রকাশক বল্‌লেন,—গল্পগুলিকে কোনো ছুতোয় একসঙ্গে জুড়ে দিলেই হয়। অবাক হচ্ছেন কী? দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কতো উপায়েই তো তা হ'তে পারে। ধরুন, সাত বন্ধু এক জায়গায় অনেক দিন পরে জড়ো হয়েছে, তারা পর-পর সাতটি গল্প বল্‌লো। আমার চেয়ে আপনিই ভালো উপায় বা'র করতে পারবেন।

—বা, তা হ'লে আর তাদের স্বাতন্ত্র্য রইলো কোথায়?

মুখ বিকৃত করে' প্রকাশক বল্‌লেন,—তা'লে আর কম পয়সা শুনে খুঁতখুঁত করছেন কেন? জোড়াতাড়া দিয়ে যা-হোক্ একটা উপন্যাস সাজিয়ে নিয়ে আসুন, দামও কিছু বেড়ে যাবে। তাই বরং করুন—আমাদেরো বেগ পেতে হয় না। আপনি সাত বন্ধুর মুখে সাত গল্প শুনে ভড়কাচ্ছেন, আপনাকে আমি এমন বই দেখাতে পারি, যার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ হচ্ছে একেকটি আলাদা গল্প। গল্পের নামগুলি

চ্যাপ্টারের সাব-হেডিং হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বইয়ের টাইটেল-পৃষ্ঠায় স্পষ্ট লিখে দেয়া আছে—উপন্যাস।

—বলেন কি? নিরঞ্জন চিড়বিড় করে' উঠলো: এ যে দিনে-দুপুরে রাহাজানি। পাঠকদের ছেলে-ভুলিয়ে পয়সা রোজগার করা।

—হ'লোই বা না রাহাজানি! খরচের টাকাট তো উঠে এলো। প্রকাশক দু' আঙুলে গোঁফ টানতে লাগলেন: আমি অবিশ্যি অমন কাণ্ড আপনাকে করতে বলছি না,—আমার দোকানের তো একটা নাম আছে। আমি তো আর অমন বাড়িতে বসে' সখের দোকানদারি করি না। আমি শুধু আপনাকে দেখাচ্ছিলুম, ছোট গল্প চালাবার জন্যে লেখকদের কতোটা নেমে আসতে হয়। পাঁচটা দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন বাজারে ওর কী হাল!

এর পর আর কী বলা যেতে পারে নিরঞ্জন ভেবে পেলো না। তার স্তব্ধতায় তার কঠিন অসম্মতি স্পষ্ট রেখায় উচ্চারিত হ'য়ে উঠলো।

প্রকাশক বল্‌লেন,—আপনার ও-সব ট্রিক্‌স্‌এ আপত্তি থাকে, বেশ ছোট গল্পের বই বলে'ই চালানো যাবে, কিন্তু যা আপনাকে দর দিলুম তার এক পাই ওপরে আমি উঠতে পারবো না।

নিরঞ্জন মুখ খুল্‌লে: দামটা যাচ্ছেতাই কম হ'য়ে পড়ছে।

—বইও তো আপনি যাচ্ছেতাই দিচ্ছেন। প্রকাশক ঠোঁটের আড়ালে দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন: বুঝলেন মশাই, পয়সা আপনার

কোনো চিরকাল থাকবে না, হয়তো বইই থাকবে। বইটাকে যে আপনার উপন্যাসের চেহারা দিতে গিয়ে কোনো কেলেঙ্কারি করতে হ'লো না, সেই তো যথেষ্ট। ছোট গল্প যে চিরকাল ছোট গল্পই থেকে গেলো—সে কি আপনার কম লাভ, কম সান্ত্বনা? আজ যান, আরেক দিন আসবেন। সে দিন এ বিষয়ে আরো কথা হ'বে। আজ আমি একটু ব্যস্ত আছি।

নিরঞ্জন বাক্যব্যয় না করে' উঠে পড়লো। হাত কচ্‌লাতে-কচ্‌লাতে বল্‌লে,—কিন্তু দামটা সম্বন্ধে আরেকবার বিবেচনা করে' দেখবেন।

প্রকাশক শ্রবণেন্দ্রিয় বধির করে' হিসেব-পত্র নিয়ে মত্ত হ'য়ে উঠলেন। চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে চলে' যাচ্ছে, প্রকাশক ডাকলেন: আর শুনুন। ছ'-চারটে নতুন গল্পও নিয়ে আসবেন। আমি সবগুলি দেখে-শুনে বেছে নেব।

ঘাড় হেলিয়ে নিরঞ্জন বল্‌লে,—কবে আবার আসবো?

—এই, say, দিন পাঁচেক বাদে। আসছে শুক্রবার। এর আগে আমার সময় হ'বে না। বলে' মুখ ভীষণ গম্ভীর করে' প্রকাশক কাগজ-পত্র ঘাঁটতে বসলেন।

রাস্তায় এসে, নিরঞ্জন এখন কী করবে, কোথায় যাবে, ভেবে কিছুই কিনারা করতে পারলো না। মোটে পঞ্চাশ টাকা! তার বিনিময়ে মাত্র এইটুকু সান্ত্বনা যে ছোট গল্প চিরকাল ছোট গল্পই থেকে যাবে। ছোট গল্প যে নিতান্ত ছোট গল্প বলে'ই বিক্রীত হ'বে—পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে সেই সাধুতার পুরস্কার।

তার এক পাই উর্দ্ধে প্রকাশক উঠবেন না, কিন্তু কোনো কারসাজিতে গল্পগুলিকে শৃঙ্খলিত করতে পারলেই টাকাটা দেখতে-দেখতে ত্রিসংখ্যাকার ধারণ করে। নিরঞ্জনের হাতের কলম নিস্‌পিস্‌ করতে লাগলো। টাকার তার ভীষণ দরকার, শ্বাস ফুরুলেই দরকার, প্রতিটি নিশ্বাস নেবার পক্ষে দরকার। এ-মাসটা তার কী হয়েছিলো, এক লাইনো গল্প সে লিখতে পারে নি। বন্ধুদের সঙ্গে কেবল অকারণ আড্ডা দিয়েছে ও এবারের টেষ্ট ম্যাচে ব্র্যাডম্যান্‌এর ফর্ম নিয়ে গবেষণা করেছে। যখনই তার টাকার ভীষণ টানাটানি, আশ্চর্য্য, তখনই তার লেখায় আর উৎসাহ নেই: কলমে মর্‌চে ধরেচে, কালি হ'য়ে এসেছে ফিকে। না লিখলে যে কাল সকালে তার উনুন ধরবে না—এ-সত্য জেনেও সে বিশেষ তৎপর হ'তে পারে নি। বরং এই মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি—লেখার দরকারের সময় লেখার এই নিদারুণ অনুৎসাহ, —পরম আলস্যে দীর্ঘ দিন-রাত্রি তাই সে সম্ভোগ করেছে। রোদ বা বৃষ্টি, রোগ বা স্বাস্থ্য—সব সময়েই যে তার লিখে যেতে হ'বে, সে-কথা অক্ষরে-অক্ষরে সে জানে,—দু'-একবার জোর করে' সে কালি-কলম নিয়ে বসেওছে, কিন্তু মনের কোথায়-কি মোচড় লেগেছে কে জানে,—টুকরো-টুকরো কবিতার ভাঙা লাইন ছাড়া কিছুই আর তার কলমের মুখে আসে নি। শুধু একদিন মলিনা তার এই অহৈতুক নিষ্ক্রিয়তাকে প্রখর রসনায় চাব্‌কে দেবার পর সে এক দমকে অনেকগুলি পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছিলো; কিন্তু সেটা নিতান্তই একটা গদ্যে গোঁয়ারতুমি মাত্র, সাহিত্যিকদের

পক্ষে বিবাহ করার মতো হাস্যাস্পদ কিছু হ'তে পারে না—তারই একটা প্রামাণিক বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। এবং এ জ্ঞান সত্ত্বেও, যে, বাঙলা-সাহিত্যে প্রবন্ধের দাম নেই, এ-প্রবন্ধের এক বর্ণও মলিনা বুঝবে না।

না-লিখে রোজগারের পক্ষে মাত্র এই ছোট গল্পগুলি তার হাতে ছিলো। পৃথিবীর অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে তার লেখায়ো হঠাৎ মন্দা পড়েছে; পুরোনো মাল না বেচে দিলে আর তার নতুন ব্যবসায় নামবার জো নেই। এই গল্পগুলি অনেকদিন থেকে তার নতুনতরো সৃষ্টির পথরোধ করে' আছে—এদের বাধাকে সরিয়ে দিতে না পারলে নবীন প্রেরণার নির্ঝরিণী আর পথ পাবে না। অতীতকালের সেই ভার থেকে যতো শিগ্‌গির সম্ভব সে মুক্ত হ'তে চায়! সেই মৃত সময়ের স্তূপ আর কতোকাল সে বহন করবে?

কিন্তু মাত্র পঞ্চাশটি টাকা! তাতেই বা সে সায় দেয় কি করে'? এই সামান্য টাকা তো তার বাড়ি-ভাড়া আর প্রিমিয়াম দিতেই ফুরিয়ে যাবে। চাকরটার জন্যে একটা গরম সোয়েটার চাই—তার কাছে আর সম্মান রাখতে না পারলে নয়, মাসের পয়লাতেই খবরের কাগজওলা হাত পাতবে, তা ছাড়া মলিনার জন্মদিন ছাব্বিশে পৌষ এই এসে পড়লো। এবার কিছু সে তাকে দিতে পারবে না বলায় সে তো এখন থেকেই অসাবধানতার ভাণ করে' চায়ের প্লেট ভাঙতে লেগে গেছে। গেলো বছর অমন দিনে তার তিন-তিনটে টিউশানি ছিলো, মলিনাকে

তাই সে-বার, বিয়ের পর প্রথম বার, কাশ্মীরি-কাজের আঁচলওলা একখানা ছাই-রঙের খদ্দর কিনে দিতে তার বেগ পেতে হয় নি। ভাড়াটে মাষ্টারের কাজ নামী সাহিত্যিকের পক্ষে ঠিক সম্মাননার হ'বে কিনা সন্দেহ করে'ই নিরঞ্জন ও-কাজে ঢিল দিয়েছে। কিন্তু আজকাল বাঙলা-ভাষার যা দুর্দ্দশা, সাহিত্যিককেও ইস্কুল-মাষ্টার না হওয়া ছাড়া গতি নেই— যদিও মাষ্টারিটা তার বেলায় নিতান্তই অবৈতনিক।

পঞ্চাশ টাকা! বল্‌লে-কইলে হয়তো প্রকাশক আরো দশ টাকা দয়া করতে পারেন। তা'লে মলিনার একখানা পোষাকি সাড়ি হয়। বিয়ে করার পর দায়িত্ব তার অনেক বেড়ে গেছে বটে, অনেক অসুবিধা, অনেক বন্ধন,—কিন্তু মলিনাকে না হ'লেই বা তার কী করে' চল্‌তো? তাকে বিয়ে না করলে কোন অত্যাচারী স্বামীর হাতে গিয়ে যে পড়তো তার ঠিক নেই। বিয়ে না করলে নিরঞ্জনের চারদিক আরো ফাঁকা ঠেকতো বটে, কিন্তু তাকে সে কোথায় কা'র কাছে ফেলে আসতো না-জানি। সে তার সাহিত্যিক ব্যাক-গ্রাউণ্ড নয়, সে জানে; সে তার সাহিত্যের উইংস—রঙ্গমঞ্চে তার প্রবেশ-প্রস্থানের পথ সে সহজ করে' রেখেছে। সে নিজে যে কতো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের সমষ্টি তার উদ্ভাবিকা হচ্ছে এই মলিনা। সে যখন লেখে, আর সে যখন লেখে না—এই দুই অবস্থার আলাদা মনোভাবের মাঝখানে মলিনা সেতু বিস্তার করে' আছে। লেখবার সময় সে পিঠের দিকে দেয়াল রেখে বসে—

সামনে থাকে জান্‌লা—মলিনা তার তেমনি পিঠের দিকের দেয়াল। একটি নিবিড় নির্ভরশীলতার নির্জ্জন প্রশান্তি। মলিনা না থাকলে কারণে-অকারণে তার লেখায় এমনি বাধা পড়তো না বটে, কিন্তু বাধা না পড়লেই আদপেই সে লিখতো কি করে' ?

সেই মলিনার জন্যে একখানি সামান্য সাড়ি চাই। জমিটা একরঙা, পাড়ে একটুখানি চটকে বাহার—এর বেশি সে প্রত্যাশা করে না। না, প্রকাশককে আরো একটু ভেজাতে হবে। অনুনয়ে না হোক্, জোর দেখাবে—বই দেবে না। নামের উপর যখন তাঁর নজর, তখন ষাট টাকায় উঠতে হয়তো তিনি রাজি হ'বেন।

নির্দ্ধারিত দিনে নিরঞ্জন আবার প্রকাশকের দ্বারস্থ হ'লো।

প্রকাশক তেমনি মুখ না তুলেই জিগ্‌গেস করলেন: আর দুয়েকটা নিয়ে এসেছেন ?

নিরঞ্জন জবাব দিলে: আর নেই। যা ছিলো, সব দিয়ে দিয়েছি। এতেই আপনার বারো-তেরো ফর্ম্মা হ'য়ে যাবে।

—তা তো যাবে। প্রকাশক মুখ তুলে চাইলেন: কিন্তু সবগুলিই তো আর আপনার হাতে উত্‌রোয় নি। আর

কতোগুলি হাতে পেলে আমার বাছবার সুবিধে হ'তো। একে ছাপ্‌বো গল্পের বই, তায় ট্র্যাস্‌ তো দিতে পারি নে।

—সত্যি কথা। নিরঞ্জন নম্র গলায় বল্‌লে,—আমার গল্পের সমঝ্‌দার আমি না হ'তে পারি, কিন্তু আপনার মতামতটাই পাঠকরা সবিশেষ গ্রাহ্য করবে—তারি বা প্রমাণ কী? কিসে যে তারা খুসি হ'বে তা কেউ হলফ্‌ করে' বলতে পারে না।

—আমি পারি। প্রকাশক টেবিল চাপড়ে প্রায় গর্জ্জে' উঠলেন: এই লাইনে আমি বিশ বছর আছি, মশাই, আমাকে আপনি শেখাতে এসেছেন? আমি গল্প বুঝি না এমন কথা আমার মুখের ওপর বলতে কেউ সাহস পায়নি জানবেন। অতো কথার দরকারই বা কী? আমি যখন টাকা দিয়ে বই নেবো, তখন আমার গল্প বাছবার সম্পূর্ণ এক্তিয়ার আছে। নাক-মুখ চোখা করে' প্রকাশক কথাটা প্রায় নিরঞ্জনের মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন: আমার যদি পছন্দ না-ই হয়, আপনি কী করতে পারেন শুনি?

নিরঞ্জন ভেঙে গিয়ে বল্‌লে,—কিন্তু সত্যিই বলছি—হাতে আমার গল্প নেই। থাকলে দিতুম বৈ কি।

—বেশ, তবে একটা গল্প লিখে দিন্। কথাটা নির্লিপ্তের মতো বলে' প্রকাশক তাঁর এক কর্ম্মচারীর সঙ্গে কথায় মেতে উঠলেন।

এ দিকে মুখ ফেরাতেই নিরঞ্জন বল্‌লে,—নতুন গল্প!

—হ্যাঁ, নতুন গল্প। এ-সব তো আপনার একটা-না-একটা মাসিক-পত্রে বেরিয়ে গেছে। এই সব চেনা লেখা দিয়ে তো

বই আরম্ভ করতে পারি না। লোকে তা'লে গল্প বলে' জেনে যাবে যে—সব মেহনৎ মাটি। বেশ ভালো করে' গল্প লিখুন—বুঝলেন না, বেশ ভালো করে'—প্রকাশক ভুরুতে টান দিয়ে, চোখের দৃষ্টি রসালো করে' বল্‌তে লাগলেন: খুলে-খেলে কিছু বলবেন না, অথচ সবাই বেশ তলিয়ে বুঝতে পারবে—একেই তো বলে মুন্সিয়ানা। ভাষা বেশ সরল হয়, আর নামটা হয় বেশ জঁাকালো। এমন নাম চাই যা শুনলেই লোকের চমক লাগে—বুঝলেন না? সেই নামেই গোড়ার গল্পটি আপনাকে লিখতে হ'বে। যাতে অসাবধানী খদ্দের অন্তত বুঝতে পারে, বইটা উপন্যাস। বুঝলেন না?

শুকনো গলায় ঢেঁাক গিলবার চেষ্টা করে' নিরঞ্জন বল্‌লে,—কিন্তু আবার নতুন গল্প লিখতে হ'বে?

—লিখতে হ'বে না? নইলে বইটাকে উপন্যাসের চেহারা দেব কি করে'? তা, গল্পও আপনার সব বেরিয়েছে দেখছি বড়ো কাগজে—মফস্বলের ছোটখাটো কোনো কাগজে বেরুলে বরং লোকের কাছে নতুন ঠেক্‌তে পারতো। নতুন গল্প লিখতে হ'বে বলে' অমন শুকিয়ে যাচ্ছেন কেন? প্রকাশক মুরুব্বিয়ানা চালে বল্‌লেন: আপনাদের কী! কলম হাতে নিয়ে বসলেই ঝর্‌ঝর্‌ করে' লেখা পড়তে থাকে। কয়েক ঘণ্টার তো মোটে কাজ। গল্পের একটা প্লট না-হয় আমি আপনাকে দিচ্ছি—এই সেবার আগ্রা হ'য়ে জয়পুর যাবার পথে—বান্দিকুই ষ্টেশনে গাড়ি বদল করবার সময়—

বাধা দিয়ে নিরঞ্জন বল্‌লে,—প্লটের জন্যে ভাবি না, তবে—

—প্লটের জন্যে যদি ভাবতেন, তা'লে গুচ্ছের এমন র‍্যাবিশ লিখে চালাতেন না। প্রকাশক চটে' উঠেছেন: আপনাদের লেখার মাথামুণ্ডু কিছু আছে নাকি? না আছে টানা ঘটনা, না আছে 'কি-হয়' ভাবের একটা সাস্‌পেন্স। গল্প জমবে কোত্থেকে? আমার গল্পটা নিন্‌, যেমন রঙচঙে, তেমনি—বুঝলেন না?

এবার কিছু সুবিধে করতে পারবে ভেবে নিরঞ্জন টেবিলের উপর আরো ঝুঁকে এসে বল্‌লে,—তা না-হয় নিচ্ছি, কিন্তু আপনার প্লট আমি ম্যানেজ করতে পারবো বলে' মনে হয় না। তার জন্যে আরো শক্তিশালী লেখক চাই হয় তো।

—তাই বলুন। প্রকাশক দু' আঙুলে গোঁফ টানতে লাগলেন: আমারটা ম্যানেজ করতে না পারেন অন্য-কোনোটা ম্যানেজ করে' নিয়ে আসুন গে। নতুন গল্প আমার চাই।

—কিন্তু, বল্‌তে গিয়ে নিরঞ্জনের চোখ চক্‌চক্‌ করে' উঠলো: কিন্তু সেই গল্পের জন্যে extra দাম দেবেন তো? এমনি মাসিক-কাগজে দিতে গেলে কিছু নগদ তো পাওয়া যেতো। রেট্‌টা তা'লে বাড়িয়ে দিন্‌।

দু' কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্রকাশক বল্‌লেন,—তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি। একে ছোট গল্প চালানোতেই হিক্কা উঠছে—তায় আবার রেট্‌! মাসিক-কাগজে একটা গল্পের জন্যে কতো আপনারা পান শুনি?

—এই দশ থেকে পনেরো।

—পনেরো না ঘেঁচু! প্রকাশক মুখ বেঁকিয়ে উঠলেন: সম্পাদকের তো কাগজে-ছাপাখানায় খরচ করে' কাজ নেই, আপনাদেরই গর্ভে সব ঢালুন আর-কি। আমি তো শুনেছি মাগ্‌না ছাপতে পারলেই আপনারা কৃতার্থ হ'য়ে যান। আর এই মাগ্‌না ছাপবার জন্যেই সম্পাদকের আপিসে লেখকরা মাসের পর মাস হত্যে দিয়ে পড়ে' থাকেন। সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে' সীতা কা'র বাপ! আমাকে আপনি হাইকোর্ট দেখাচ্ছেন? প্রকাশক চেয়ারের উপর দু' পা তুলে গ্যাঁট্‌ হ'য়ে বস্‌লেন: বেশ, আপনার কথাই ধরে' নিচ্ছি। প্রতি গল্পে যদি পনেরো টাকা করে'ই পেয়ে থাকেন, তবে ঐ ছ'টায় মিলিয়ে তো আপনার অল্‌রেডি নব্বুই টাকা রোজগার হয়েছে, মশাই। আবার তবে টাকা চান্‌ কোন মুখে? পঞ্চাশ টাকা তো আমি বেশি বলেছি।

কী যে যুক্তি উত্থাপন করা যেতে পারে, নিরঞ্জনের সমস্ত ভাবনা ঘুলিয়ে গেলো। কেবল বল্‌লে,—কিন্তু নতুন একটা গল্প লিখে দিতে হ'বে—

—আচ্ছা, যান্‌ মশাই, আরো পাঁচ টাকা না-হয় দেয়া যাবে। সাহিত্যিক হ'য়ে এ রকম দরাদরি করেন, ভাবতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। যান, ঐ কথা রইলো—পঞ্চান্ন টাকা। বকে'-বকে' জিভে আমার কড়া পড়ে' গেলো। প্রকাশক পা নামিয়ে জুতো খুঁজতে লাগলেন।

নিরঞ্জন উঠতে-উঠতে বল্‌লে,—আবার তবে কবে আসবো?

—বাঃ, আগে গল্প লিখে আনুন, পছন্দ হোক্‌।

—গল্প তো আমি দু'দিনেই লিখে ফেলতে পারবো। নিরঞ্জনের ঠোঁটের একটা কোণ কেঁপে-কেঁপে উঠলো: আমাদের কলম তো মশাই কল্পতরু, নাড়া দিলেই গল্প-কবিতা পড়তে থাকে। আমাদের লিখতে কতোক্ষণ!

কথাটা সোজাসুজি বুঝে নিয়ে প্রকাশক বল্‌লেন,—বেশ, তবে ঐ দু' দিন পরেই আসবেন।

যাক্‌, পাঁচ টাকা বাড়ানো গেল—একটা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কবিতা লেখার চাইতে বড়ো সান্ত্বনা। বাড়ি-ভাড়া ও প্রিমিয়াম দিয়ে মলিনার জন্যে একখানি ধোয়া-সুতোর সাড়ি হ'বে মনে হচ্ছে। কিন্তু তার একটা ফাউন্টেন-পেনেরো ভীষণ দরকার। থাক্‌, খ্যাঁদা নাকে আর নথ পরে না। তার চেয়ে জন্মদিনে মলিনার একখানি নতুন সাড়ি হোক্‌। পাঁচ টাকা! সিভিল কোর্টের একটা রায়ের নকল লিখে দিলে তার এর চেয়েও হয়তো বেশি রোজগার হ'তো। কিন্তু উপায় কী! ঈশ্বর তাকে তার জন্ম-মুহূর্ত্তে 'লেখক' বলে' কলঙ্কিত করে' দিয়েছেন। ভ্যাগের সেই পরাক্রান্ত দস্যুতার থেকে তার পরিত্রাণ নেই। সে কেরানি হ'তে পারে না, ইস্কুল-মাষ্টার হ'তে পারে না, সে এই জন্মে বাঙলা দেশের একজন গরিব, একজন নিরীহ লেখক মাত্র। এবং এই লিখেই তাকে আমরণ গ্রাসাচ্ছাদন করতে হ'বে।

রুদ্রের আবির্ভাব

বাড়ি-ওলা আজ আবার তাগাদা দিতে এসেছিলো। বেচারা বাড়ি-ওলারো মাসান্তে এই যা রোজগার। তার পক্ষে চাকুরে ভাড়াটে পাওয়া দরকার,—সে বলে' গেলো: আপনি পরের মাসে দয়া করে' উঠে যাবেন। এবার যিনি আসচেন তাঁর মাইনের সংখ্যাটা আগে থেকেই জেনে রাখতে হ'বে দেখছি। হ্যাঁ, তার টাকাটা যতো শিগ্‌গির সম্ভব ফেলে দিতে হ'বে। নতুন গল্পটা এখুনি লিখে ফেলা চাই। নতুন গল্প না আরো-কিছু। পুরোনো একটা গল্পই সে নাম বদ্‌লে নিজ হাতে টুকে নিয়ে যাবে। যেমনি হাঁড়ি, তেমনি তাঁর সরা চাই। প্রকাশককে ঠকাচ্ছে ভেবে নিরঞ্জন মনে-মনে খুব খানিকটা খুসি হ'য়ে উঠলো।

বাড়ির বাইরে বাড়ি-ওলা: বাড়ির ভেতরে,—না, সে-দিকে আর নজর দিয়ে কী হ'বে?

ঠিক দু'টি দিন পরে নয়, ইচ্ছে করে' আরো দুইদিন দেরি করে' (ঘন-ঘন গেলে পাছে প্রকাশক বিরক্ত হ'ন) নিরঞ্জন প্রকাশকের দোকানে হাজির হ'লো।

প্রকাশক তেমনি, মুখ না তুলেই বল্‌লেন,—এনেছেন নতুন গল্প?

—হ্যাঁ। পকেট থেকে পেপার-ক্লিপ-দিয়ে-আঁটা এক গাদা আলগা কাগজ নিরঞ্জন বা'র করলে।

হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিয়ে প্রকাশক বল্‌লেন,—বাঃ, কাগজের তো খুব বাহার দেখছি। লেখেন কি ছাই

কে জানে, এদিকে ভাঙা পিঁড়েয় তো আলপনার সীমা নেই।

নিরঞ্জন সামনের বেঞ্চিতে র‍্যাপারে জড়োসড়ো, সঙ্কীর্ণ হ'য়ে বস্‌লো। বল্‌লে,—আশা করি এতেই আপনার চলবে। টাকাটা যদি আজ দেন্—

—টাকা! বলেন কি! এক্ষুনি? প্রকাশক চম্‌কাবার ভাণ করে' বল্‌লেন,—দাঁড়ান, গল্পটা আগে পড়ি।

—হ্যাঁ পড়ুন না। যা মুখে এলো নিরঞ্জন তাই বলে' ফেল্‌লে: কয়টা বা পৃষ্ঠা! পড়ে' নিতে আপনার কতোক্ষণ বা লাগবে। আমি ততোটুকু সময় না-হয় বসছি।

কথাটা লুফে নিয়ে প্রকাশক চিন্তিত মুখে বল্‌লেন,—হ্যাঁ, গল্পটা নেহাৎই ছোট মনে হচ্ছে। তারপর পৃষ্ঠা উল্‌টে একেবারে শেষ শ্লিপে চলে' গিয়ে তিনি চোখ বড়ো করলেন: মোটে তেরো শ্লিপ্। এতে যে মশাই পুরো এক ফর্ম্মাও হ'বে না। করেছেন কি?

এই শীতেও নিরঞ্জন ঘেমে উঠলো: তবে কতো বড়ো আপনার চাই?

—অন্তত টানা তিন ফর্ম্মা। তখনই তো লোকে উপন্যাস বলে' ভুল করতে পারবে! আপনাকে বাড়তি পাঁচ টাকা দিতে রাজি হয়েছিলুম কি মশাই এরি জন্যে? এতো তাড়াতাড়ি করবারই বা কী হয়েছিলো? দু'টি দিন সবুর করলে আমার দোকান আর উঠে যেতো না।

চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে ঘাড় হেঁট করে' নিরঞ্জন বল্‌লে,—কিন্তু গল্পটা বেশ ভাল হয়েছিলো—

—তা-ও বা পড়ে' দেখবার সময় দিচ্ছেন কই? দোকানে বসে' কি পড়া যায়? কিছু suggestion দেবার আছে কি না তা-ও তো মশাই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে হ'বে।

নিরঞ্জন প্রায় লাফিয়ে উঠলো: নিশ্চয়, suggestion দেবেন বৈ কি। প্রুফেই সেগুলো ঠিক করে' নেয়া যাবে। কি বলেন?

—বেশ। প্রকাশক গল্পটা টানার মধ্যে পুরে রাখতে-রাখতে বল্‌লেন,—প্রুফেই এ-দিক ও-দিক বাড়িয়ে দেবেন না-হয়! প্রেস তো আমার নয়, সেজন্যে দু'বার কম্পোজের ভয় আমার করতে হ'বে না। প্রকাশক একটু মুচকে হাসলেন বলে' মনে হ'লো।

—তবে, নিরঞ্জন হাত কচ্‌লাতে-কচ্‌লাতে উঠে পড়লো: গল্পটা পড়তে আপনার কতোদিন লাগবে?

—তা একটু লাগবে বৈ কি! কতো কাজের মধ্যে আমাকে সময় করে' নিতে হয়। আপনাদের কি, বসেন আর লেখা বেরুতে থাকে। আমাদের হিসেব মেলাতেই প্রাণান্ত।

—তবু? পশু' আসতে পারি? পশু'র মধ্যে আপনার পড়া হ'য়ে যাবে আশা করি।

—তা হয়তো যাবে। দেখি। কিন্তু আসবেন দু' চার দিন দেরি করে'। এখন মশাই, ইস্কুল-সিজ্‌ন্। মফঃস্বলে বই পাঠানো নিয়ে ভারি ব্যস্ত।

কিছুদূরে একটা দিন ফেলে নিরঞ্জন বল্‌লে,—এই বেস্পতিবার? কেমন?

প্রকাশক বিড়বিড় করে' বল্‌লেন,—আসবেন। কথাটার জোর পড়লো 'ন'-এর উপর।

তবু যাক্‌, প্রকাশককে জপানো গেছে। নতুন গল্পটার উপর আর হয়তো অত্যাচার করতে হ'বে না, কিন্তু না আঁচালে বিশ্বাস নেই। পরিণামে কী যে হয়, এতো দুঃখের মাঝে এ-ও ভাবতে নিরঞ্জনের মজা লাগে। কিন্তু মলিনার জন্মদিন প্রায় এসে পড়লো। বাড়ি-ভাড়া ও প্রিমিয়ামের টাকার চাইতে মলিনার জন্যে আটপৌরে নতুন একখানা সাড়ির বেশি দাম।

তারপর—বেস্পতিবার।

—গল্পটা পড়লেন?

—হুঁ, পড়লাম বৈ কি।

—কেমন লাগলো? কথাটা জিগ্‌গেস করতে নিরঞ্জনের বুক ধুক্‌ধুক্‌ করছে।

—আপনাদের গল্প যেমন লাগে। আগাপাশতলা সব আছে, নেই কেবল ঐ আসল বস্তুটি।

নিরঞ্জনের কেমন-যেন মনে হ'লো গল্পটা প্রকাশকের পছন্দ হয়েছে, অথবা ওর বিরুদ্ধে ততো ওঁর আপত্তি নেই। তাই,

অন্তরঙ্গ হ'বার চেষ্টায় সে বল্‌লে,—কিছু suggest করবার আছে নাকি আপনার ?

—আছে বৈ কি।

কথার ধাক্কায় নিরঞ্জন ছিট্‌কে পড়লো। ভয়ে-ভয়ে জিগ্‌গেস করলে: কি ?

—এই, গল্পটা আরেকটু টেনে-বুনে লম্বা করতে হ'বে। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা মশাই, ওজন বুঝি, দৈর্ঘ্য বুঝি,—আপনাদের ও-সব শুকনো চিম্‌সে আর্টে আমাদের পেট ভরে না। গল্পটা আরেকটু বড়ো করে' দেবেন—অন্তত দেড়-ফর্মাটাক্।

বুকের থেকে রুদ্ধশ্বাসের পাথরটা নামিয়ে দিয়ে হাল্‌কা, ফুর্ত্তির গলায় নিরঞ্জন বল্‌লে,—তা মেপে-জুকে প্রুফে ঠিক করে' দিতে পারবো। তা গল্পটা আপনার এমনি ভালো লেগেছে তো ?

বিরাট একটা হাই তুলে প্রকাশক বললেন,—কা'র মশাই আপনার গল্প পড়বার দায় পড়েছে ? আমার অতো সময় কোথায় ? নাকে-মুখে পথ পাই না, তায় বসে' গল্প পড়ি আর কি ! গল্প আমাদের পড়তে হয় না। আমরা মশাই ব্যবসা করতে বসেছি।

নিরঞ্জন নিশ্বাস ছাড়লো। বললে,—তবে টাকাটা—

—টাকা ? আজ ? আজ কী বার জানেন ?

ভয়ে-ভয়ে নিরঞ্জন বল্‌লে,—বেস্পতিবার।

—লক্ষ্মী-বারে কেউ কোনোদিন পেমেণ্ট করে শুনেছেন ?

আমি অন্তত করি না। এ দিনে ঘরের টাকা বা'র করে' দিলেই হয়েছে আর কি!

—তবে কাল আসবো?

—আপনি যে দেখছি একেবারে ঘোড়ায় চড়ে' এসেছেন। প্রকাশক প্রায় রুখে উঠলেন: গতর খাটিয়ে তো আর রোজগার করতে হয় না, টাকার মূল্য আপনারা বুঝবেন কী! কি ছাই দু'চার ফোঁটা কালি খরচ করেন আর দাম হাঁকেন যেন সমুদ্র সেঁচে মুক্তো কুড়িয়ে এনেছেন!

—তবে শনিবার আসবো? টাকার খুব টানাটানি বলে'ই একটু তাড়া করছি।

—আর আমার একেবারে টাকার বন্যা বয়ে' যাচ্ছে, না? এখন আমার কতো খরচ—তা দেখবার আপনাদের চোখ কোথায়? রোজ প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা অর্ডার সাপ্লাই করতে হয়—ভি-পি টি-পি সব রাখে কি না তার ঠিক নেই! আপনি আছেন নিজের সুখে।

—তবে একেবারে সোমবারেই আসবো। নিরঞ্জন উঠে পড়লো।

—তাই আসবেন। আপনার সঙ্গে কে এঁটে উঠবে। তবে দয়া করে' একটু রাতের দিকে যেন আসবেন। এ সময়টা ভারি ভিড় থাকে।

সোমবার রাতের দিকে এসে নিরঞ্জন দেখলো প্রকাশক দোকানে নেই। ঘণ্টা খানেক আগে কোথায় বেরিয়ে গেছেন।

তারপর মঙ্গলবার।

নিরঞ্জন হাসি মুখে বল্‌লে,—আজ পাওয়া যাবে তো?

—কাল কোথায় ছিলেন? প্রকাশক বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন,—কাল আপনার জন্যে বসে'-বসে' হায়রান, কাণ্ডজ্ঞান সাহিত্যিকদের যে এতো কম, এই প্রথম টের পেলুম, মশাই। আপনার জন্যে বসে' থেকে-থেকে আমার একটা লাইব্রেরির অর্ডার হাতছাড়া হ'য়ে গেলো। এর এখন ক্ষতিপূরণ করে কে?

নিরঞ্জন হাসিমুখেই বল্‌লে,—কাল আমি এসেছিলাম। কিন্তু শুনলাম তার আগেই বেরিয়ে গেছেন।

—যাবো না? বসে'-বসে' তবে শেকড় গজাবো নাকি? রাতের দিকে আসতে বলেছি বলে' একেবারে রাত করে'ই আসতে হয় নাকি? আপনাদের কি, খান, দান, ঘুরে বেড়ান— আমাদের কতো কাজ, মরবার পর্য্যন্ত সময় নেই।

মনে-মনে প্রকাশকের দীর্ঘ আয়ু কামনা করে' নিরঞ্জন বললে,—তা, আজকেই তো আপনার দেখা পেলাম। আজই হ'য়ে যাক্।

—বেশ গালভরা মোলায়েম একখানা কথা বললেন বা-হোক। আজ হয় কি করে'? আজ সব অন্য পাওনাদারদের আসবার কথা। এক সপ্তাহ পরে আসবেন।

—এক সপ্তাহ!

—হ্যাঁ, টাকা জোগাড় করতে হ'বে তো? পঞ্চাশ টাকা কি যে-সে কথা?

—পঞ্চাশ নয়, নিরঞ্জন ঢোঁক গিলে বল্‌লে,—পঞ্চান্ন।

—আপনাকে নিয়ে আর পারি না, মশাই। আচ্ছা, চড় মেরে নেবেন না-হয় আর পাঁচ টাকা বেশি। যখন আপনাদের সঙ্গে কারবার করতে বসেছি, কী আর করা যাবে।

নিরীহতরো হ'য়ে নিরঞ্জন হাসিমুখে বল্‌লে,—পঞ্চাশ টাকা জোগাড় করতে আপনাদের কী! ড্রয়ারের মধ্যেই তো কতো আছে—ঐ চেঞ্জ দেবার সময় দেখলাম।

—তা তো দেখবেনই। প্রকাশক টেবিলের এককোণে তেরছা করে' পা তুলে দিয়ে আয়েসী গলায় বল্‌লেন: আপনাদের দৃষ্টিই তো কেবল ঐ দিকে। পরের টাকা তো বেশিই দেখেন আপনারা। ও দিকে এক প্রেসের বিল মেটাতে হ'বে, পঞ্চাশটি টাকাও বাঁচবে না।

নম্র গলায় নিরঞ্জন বল্‌লে,—পঞ্চাশ নয়, পঞ্চান্ন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ মশাই, পঞ্চান্ন। বলছি, পঞ্চাশ টাকাও তার থেকে থাকবে না। আপনাকে দেব কী?

—বেশ তো খানিক না-হয় দিন, যা পারেন। আমি রিসিট লিখে দি।

—রিসিটে-ফিসিটে হ'বে না মশাই, প্রকাশক গম্ভীর মুখে বল্‌লেন,—দস্তুরমতো ডিড্ লিখে দিতে হবে। তাই তো বলছি আজ হ'বে না।

নিরঞ্জন বল্‌লে,—এর আবার ডিড্‌ কি! এক-আনার একটা ষ্ট্যাম্পের উপর সই করে' টাকাটা পেলাম লিখে দিলেই তো হ'লো।

—তা তো হ'লো, প্রকাশক ঘাবড়ে গিয়ে বললেন,—কিন্তু টাকা আসে কোত্থেকে?

—নগদ না পারেন, একটা চেক্ লিখে দিন না।

ঘাড় হেলিয়ে প্রকাশক বললে,—চমৎকার বল্‌লেন যা-হোক্। আপনার ঐ সামান্য টাকার জন্যে আমার ব্যাঙ্ক-য়্যাকাউণ্ট ডিস্‌টার্ব করি! আছেন বেশ। সামান্য টাকা, আরেকদিন আসবেন, ফেলে দেবো। অতো বড়ো-বড়ো কথায় কাজ কী!

—বেশ, কবে আসবো তবে? কাল? নিরঞ্জন দাঁড়ালো।

—কাল নয়, পরের বুধবার।

—কখন?

—রাত আটটার পর।

—দোকান খোলা থাকবে তো?

—থাকবে।

—আপনার দেখা পাবো তো?

—পাবেন।

—কথার আর নড়চড় হ'বে না আশা করি।

—না। না, মশাই। ভদ্রলোকের এক কথা। প্রকাশক গম্ভীর গলায় বল্‌লেন,—টাকা যেদিন দেবো বলি, ঠিক দিই।

এর আগে টাকা দেবার ফাইন্যাল তারিখ আপনাকে দিয়েছি কোনোদিন ?

'নিরঞ্জন বল্‌লে,—না। তা দেন নি বটে।

—দিতেই পারি না। ও আমার স্বভাবই নয়। মুখ ফুটে যেদিন দেবো বলি, বেমালুম দিয়ে দি। আপনি আসবেন বুধবার, নির্ঘাৎ পেয়ে যাবেন। গভর্ণমেণ্টের মাইনের চেয়েও নিশ্চিত আমার কথা। যান, এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমুন গে।

নিরঞ্জন যাবার আগে আরেকবার মনে করিয়ে দিলে: পরের বুধবার, রাত আটটার পর।

—হ্যাঁ, রাত আটটার পর।

—পরের বুধবার।

—পরের বুধবার।

তারপর সেই বুধবার এলো।

তক্তপোষ থেকে নেমে নিরঞ্জন সবে ঘুমের জড়িমা ভাঙছে, মলিনা তাড়াতাড়ি কোথা থেকে ছুটে এসে পায়ের কাছে উবু হ'য়ে বসে' পড়লো। তারপর অনর্গল কণ্ঠে হাসতে-হাসতে, পায়ের উপর ঘোমটা-খসা শুকনো বেণীটা লুটিয়ে দিয়ে সে স্বামীকে প্রণাম করলে।

দু'হাতে তাকে তুলে নিয়ে নিরঞ্জন বল্‌লে,—ও! আজই তোমার জন্মদিন। বাঙলা তারিখ-ফারিখ আমার একদম আসে না। যাক্ ভালোই হ'লো, টাকাটা আজ পাওয়া যাবে।

—যাবে? আমার জন্যে একখানা আনবে তো কিনে? মলিনা খুসিতে উথলে উঠলো।

—নিশ্চয়। আর তোমার পাওনাদাররা যদি আজ আবার আসে, তো তাদের রাত্রে আসতে বলতে পারো। আজ খানিকটা হাল্‌কা হওয়া যাবে।

—ঠিক পাবে, না?

—খুব সম্ভব। তবে যেমন ভাগ্য, বলা যায় না। আজ যদি না দেয় তো ঠিক মারামারি করে' বসবো।

—হ্যাঁ, আর তোমার অমনি জেল হ'য়ে যাক্। খবরদার, তুমি বই ফিরিয়ে নিয়ে এসো। এ একটা মাস তুমি কিছুই লিখলে না।

—এর একটা হেস্তনেস্ত না-হওয়া পর্য্যন্ত কোনো কাজে আর হাত দিতে ইচ্ছে করে না। যাক্, আজই একটা হ'য়ে যাবে। তোমার কি-রকম সাড়ি চাই বলো তো?

লজ্জিত হ'য়ে মলিনা বল্‌লে,—যা তুমি দেবে।

—আর শোনো, নিরঞ্জন বলতে-বলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো: তাড়াতাড়ি যা-হোক দুটো রেঁধে দাও—চাকরটা পিট্‌টান দিয়েছে, দিক্—আমিই যা হোক বাজার এনে দিচ্ছি। খেয়ে-দেয়েই বেরিয়ে পড়তে হ'বে! সমস্ত দিন

পাব্‌লিশারকে স্পাইং করতে হ'বে, যেন চোখ ফস্‌কে কোথাও না সরে' পড়তে পারে। তারপরে ঠিক আটটার পরে। এতোদিন ঘুরিয়েছে, আর নয়।

কিন্তু আজো, ঘুরোলে যে সত্যিই কী করতে পারে, নিরঞ্জন মলিনাকে কিছু অভয় দিয়ে যেতে পারলো না।

দুপুরের আগেই নিরঞ্জন বেরিয়ে গেছে, তারপর ঘরময় স্তব্ধতার মাঝে তার ফিরে-আসার পদধ্বনি ছাড়া মলিনা কিছুরই আর প্রতীক্ষা করতে পারছে না। সময় গড়িয়ে-গড়িয়ে অন্ধকার হ'য়ে এলো, আকাশে হেলানো চাঁদের চেহারা দেখে সে বুঝতে পেরেছে আটটার আর বাকি নেই। তারপর চাঁদ আরো উঠে এলো, দূরে নারকেল-গাছের পাতা আধো অন্ধকারে একটু-একটু করে' কাঁপছে। ঐ বুঝি তিনি এলেন। মলিনা উনুন নিভিয়ে, ভাতের থালা ঢেকে, দেয়ালে পিঠ রেখে চুপ করে' বসে' আছে তো বসে'ই আছে।

তারপর, কতোক্ষণ বাদে কে জানে, দরজায় কড়া নড়ে' উঠলো। ও কা'র হাতের ছন্দ, মলিনাকে বলে' দিতে হ'বে না। সত্যি-সত্যি নিরঞ্জনের এসে পড়বার চাইতে তার আসার এই সম্ভাবনাটাই কতো রোমাঞ্চময়। শরীরের সমস্ত শীত ঝেড়ে ফেলে মলিনা লাফিয়ে উঠলো।

হ্যাঁ, নিরঞ্জন। শীতে একেবারে এতোটুকু হ'য়ে এসেছে। মুখে কথা নেই।

নিরঞ্জন ভিতরে এসে দেখলে, ঘর-দোর যেন চারদিক

থেকে খিল্‌খিল্ করে' হাস্‌ছে। দেয়ালে না আছে এতোটুকু ঝুল, তক্তপোষের তলায় না একবিন্দু আবর্জ্জনা। বাক্সের উপর রং-ছুপানো পুরোনো কাপড়ের ঢাকনি, বিছানার উপর সদ্য কাচা কুঁচকোনো চাদর। তার লেখবার ছোট টেবিলটির উপর একটি ছোট শঙ্খ—মলিনার হাতের মুঠিটির মতো; ক্যান্‌ভাসের ইজি-চেয়ারের ওপর ফর্সা ডোরা-কাটা তোয়ালে। কেবল মলিনারই পরনে ছেঁড়া, ময়লা একখানি সাড়ি।

চেয়ার টেনে নিরঞ্জন নীরবে বসে' পড়লো। মলিনা এটুকু অন্তত লক্ষ্য করলে র‍্যাপারের তলায় তার হাতে কোনো কাগজে-মোড়া প্যাকেট নেই।

কাছে সরে' এসে মলিনা ম্লানতরো হ'য়ে বল্‌লে,—টাকা আজো পেলে না বুঝি?

নিরঞ্জনের গলা চিরে বেরুলো: না।

—যাক্ আমি ভাবছিলাম বুঝি পেয়েছিলে, আসবার সময় পকেট কাটা গেছে। যেমন একখানা মুখ করে' এসেছ। আর যা আমাদের অদৃষ্ট। তা, কেন পেলে না বলো তো? দেখা হয়েছিলো?

—হয়েছিলো।

—তবে? দিলো না বুঝি? মলিনা আরো সরে' এলো।

নিরঞ্জন ভাঙা গলায় বল্‌লে,—দিতেও চেয়েছিলো।

—তবে? মলিনা অস্থির হ'য়ে উঠলো: দর নিয়ে বুঝি আবার ঝগড়া বাধ্‌লো? পাঁচটাকা বেশি বুঝি কিছুতেই দেবে না?

—না, পঞ্চান্ন টাকাই সে দিতো। টেব্‌লের ওপর জলজ্যান্ত নোটগুলি সে মেলে ধরেছিলো।

—তবে? তোমাকে ফেলে অন্য পাওনাদারকে দিয়ে দিলো বুঝি?

—না, দোকানে আমি ছাড়া আর কোনো পাওনাদার ছিলো না।

—তবে কী হ'লো? বলো, বলো শিগ্‌গির। ডাকাত পড়লো দোকানে?

নিরঞ্জন হাসলো: আমি ছাড়া ঐ ঘৃণ্য সামান্য টাকার উপর কে ডাকাতি করতে আসবে বলো?

—বুঝেছি, তোমাকে অপমান করে' কথা বলেছে, আর তুমি চটে'-মটে' চলে' এসেছ।

নিরঞ্জনের মুখে সেই তীব্র হাসি: সাহিত্যিকদের অপমানবোধ বলে' কোনো দুর্ব্বলতা নেই, মলিনা। তা ছাড়া পাবলিশার আজ কথায় খইয়ের মোয়ার চেয়েও মিষ্টি আর মোলায়েম।

—তবে, কেন, কেন তুমি টাকা পেলে না? নোটগুলি জাল ছিলো বুঝি? মলিনা স্বামীর হাত ধরে' টানাটানি করতে লাগলো: বলো, বলো, সাধা টাকা তুমি আনলে না কেন?

নিরঞ্জন হঠাৎ বিকৃত গলায় হেসে উঠলো: সে ভারি মজার ব্যাপার। তুমি তা ধারণাও করতে পারবে না।

—কী? মলিনা ভয়ে-ভয়ে ঘরের চারিদিকে চাইতে লাগলো:

জাল নোট বলে' পুলিশ ওকে তক্ষুনি ধরে' নিয়ে গেলো বুঝি; বুঝেছি, নিশ্চয়ই কোনো কাণ্ড ঘটেছে।

সেই হাসির রেশ তখনো থামে নি। আরেক পর্দা চড়িয়ে নিরঞ্জন বল্‌লে,—অতো কিছুই সমারোহ নয়, মলিনা। সামান্য এক আনার মামলা।

—তার মানে?

—তার মানে,—ভাগ্যের কী সূক্ষ্ম চক্রান্ত। সব ঠিকঠাক, টাকা তৈরি, লেখাপড়া সব পাকা,—সই করবার সময় দেখা গেলো দোকানে এক আনার একখানাও টিকিট নেই। কোনো টিকিটই নেই—চিঠি লিখতে আর পার্শেল করতেই সব ফুরিয়ে গেছে। পারে এসে আবার মাঝনদীতে ভেসে পড়লাম। জীবনে এমন একটা ছোট ঘটনার এতো বড়ো একটা পরিণাম কল্পনা করতে পারো? ছোট গল্পের কী চমৎকার আইডিয়া! না?

তার চুলে হাত বুলুতে-বুলুতে মলিনা বল্‌লে,—তাতে কি? কাল সঙ্গে করে' একখানা এক আনার টিকিট নিয়ে গেলেই হ'বে।

—কাল হ'বে না।

—কেন?

—কাল লক্ষ্মী-বার।

—তবে কবে হ'বে?

—দেখি। নিরঞ্জন হারিকেনের ম্লান, অস্বচ্ছ আলোয় মলিনার গা-ময় ময়লা শাড়িখানির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো।

মৃত্যু

সকালবেলা নিচে বৈঠকখানায় বসে' লোকেশ একটা রেগুলার-আপিসের গ্রাউণ্ড্‌স্‌ ড্রাফট্‌ করছে, একজন ভদ্রলোক খোলা দরজা দিয়ে সরাসরি তার কাছে এসে একটু কুণ্ঠিত গলায় বল্‌লে, —আপনার একটা চিঠি।

লোকেশ তার দিকে এমন তাচ্ছিল্যে তাকালো যে মাত্র ঐ একটা চাউনিতেই যেন তার সমস্ত অন্তরাত্মা হ'লো উদ্‌ঘাটিত। ভদ্রলোক কী বুঝলো ভদ্রলোকই জানে, কিন্তু আমরা দেখলাম তার ডাঁটালো নাকে, চওড়া কপালে, চাপা চিবুকে, নিষ্ঠুর নির্লজ্জ ঔদাসীন্য। সামান্য একটা চিঠির মোড়ক খুলতে অলক্ষিতে আঙুলে যে ঈষৎ অসহিষ্ণুতা জাগে, তার যেন ততোটুকু উৎসাহও সহ্য হ'বে না। চিঠির মধ্যে অপ্রত্যাশিতের যে বিস্ময় আছে তার স্নায়ুমণ্ডলী তা মানতে রাজি নয়। কী জানি কা'র চিঠি!

খামটা ছিঁড়ে ফেলে চিঠিটা সে নিশ্বাসের অর্দ্ধপথেই পড়ে' ফেল্‌লে। নথি-পত্রের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে নির্লিপ্ত গলায় বল্‌লে,—আপনার ভুল হয়েছে, এ বাড়ি নয়।

ভদ্রলোক চঞ্চল হ'য়ে বল্‌লে,—ভুল, ভুল কেন হ'তে যাবে? আপনিই কি লোকেশলোচন—

—চক্রবর্ত্তী। হ্যাঁ, খামের ওপরে আমারই নাম দেখছি বটে। লোকেশ তবুও এতোটুকু চিন্তিত হবার চেষ্টা করলে না, বল্লে—তা আমার name-sake ডাক্তার অনেক থাকতে পারে, মশাই। আমি ডাক্তার নই, উকিল। আপনার ঠিকানা ভুল হয়েছে।

ভদ্রলোক জোর-গলায় বল্লে,—না, আমার ভুল হয় নি। আমি উকিল লোকেশবাবুর কাছেই এসেছি।

—তা আসুন, আপত্তি নেই; কিন্তু আমাদের কাছে আসবেন ব্রিফ্ নিয়ে, মামলা জিতিয়ে দেবো। রুগীর প্রেস্ক্রিপ্শানের আমরা কী জানি!

—প্রেস্ক্রিপ্শান নয়, ভদ্রলোক নিরীহ, নিস্তেজ গলায় বল্লে, —সীতেশবাবু আপনাকে একবার যেতে বলে' দিয়েছেন।

—তা তো চিঠিতেই দেখতে পাচ্ছি। লোকেশ চিঠিটায় দ্বিতীয়বার চোখ বুলোলো, ঠাট্টায় ঠোঁটের বাঁ কোণটা একটু বেঁকিয়ে বল্লে,—তা আপনার বাবু দেখছি বেজায় রসিক। তাঁর স্ত্রী মরতে চলেছেন, সেখানে আমি গিয়ে কী করবো? স্ত্রীর কোনো উইল-টুইল করতে হ'বে নাকি? কই, তা-ও তো কিছু চিঠিতে লেখা নেই। যান, আপনার বাবুকে গিয়ে একবার জিগ্গেস করে আসুন।

ভদ্রলোক কাতর মুখভাব করে' বিবর্ণ গলায় বল্লে,— মা-ঠাকরুন সত্যিই বেশিক্ষণ আর নেই। আপনি দয়া করে' একবারটি চলুন!

—কিন্তু আমি গিয়ে করবো কী তাই বলুন শুনি। কে না, কে সীতেশবাবু, তাঁর স্ত্রী বসেছে মরতে, সেখানে আমার কী করবার আছে! ব্যাপারটা যে আপনারা মশাই, যাচ্ছেতাই ঘোরালো করে' তুললেন। দেখুন আরেক বার ভেবে। লোকেশ অমনোযোগী হ'বার চেষ্টা করলে: আপনার বাবু নিশ্চয়ই শোকের মাথায় কা'র ঠিকানা লিখতে আর-কা'র ঠিকানা লিখে দিয়েছেন। অবস্থা খারাপ বুঝলে, আমি ড্রাইভার-সমেত আপনাকে গাড়ি দিচ্ছি, চট্ করে' জেনে আসুন গে। আমি নই, মশাই। এ কখনো হ'তে পারে?

—আপনিই। ভদ্রলোকের কথাটা এবার একটা কঠিন তিরস্কারের মতো শোনালো: মা-ঠাকরুন আপনাকে একবারটি দেখতে চেয়েছেন।

গলা ছেড়ে লোকেশ হঠাৎ হেসে উঠলো: টেবিলে একটা চড় মেরে বললে,—এ বলে কী! আপনি কি দিনে-দুপুরে পাগল হ'লেন নাকি মশাই? মাননীয় ভদ্রলোকের স্ত্রী, মরতে বসেছেন বলে' কি মাথা তাঁর এমনি খারাপ হয়েছে যে চেনেন না শোনেন না কোথাকার এক উকিলকে দেখবার জন্যে আবদার করবেন? এ যে মশাই, উপন্যাসেও পড়া যায় না।

হাসি থেমে গেলে সহসা ঘরের শূন্যতা যেন ভীষণ নিঃশব্দে হাহাকার করে' উঠলো। গলা নামিয়ে লোকেশ জিগগেস করলে: আপনার মা-ঠাকরুণের নাম বলতে পারেন?

—পারি।

—কী ?

—শ্রীযুক্তা—

—নাম, নাম।

—লীলাবতী—

—লীলা ? তাই বলুন। মোকদ্দমা-সম্পর্কে নতুন একটা কেস্-ল'র নজির পাওয়ার মতো প্রায় সে যেন একটা ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল্ আরাম অনুভব করলে: That Lily ? হুঁ ! বিয়ে করেছিলো শুনেছিলাম। ও ! আপনার ঐ সীতেশবাবুকে বুঝি ? কী করেন ভদ্রলোক ?

ভদ্রলোক বল্‌লে,—সাতক্ষীরার ওদিকে তাঁর জমিদারি আছে। আমি তাঁর সরকার—এই পঁচিশ বছর, তাঁর বাবার আমল থেকে কাজ করে' আসছি।

—লীলা, লীলা, নামটা টেনে-টেনে বার দুই উচ্চারণ করে' লোকেশ কাগজপত্রে ফের মন দিলে; বললে,—গোড়ায় সেই কথাটা বললেই হ'তো। আপনাকে তা হ'লে মিছিমিছি আর পাগল ঠাওরাতাম না।

প্রায় আপ্যায়িত হ'বার ভঙ্গি করে' সরকার বল্‌লে,—না, না, তাতে কিছু আমি মনে করিনি।

—কিন্তু মেয়েদের সব-সময়েই স্বামীর নামে পরিচয় দিতে হ'বে এ অত্যন্ত কু-প্রথা, মশাই। কে-না-কে এক সীতেশবাবুকে বিয়ে করেছে বলে'ই লীলা চিরজীবনের জন্যে সীতেশবাবুরই স্ত্রী থাকবে, এ-ও এক চমৎকার আবদার দেখছি। লোকেশ

রেখাহীন, নিশ্চিন্ত মুখে জাজ্‌মেণ্টের সার্টিফাইড্‌ কপি-র উপর নীল পেন্সিলে মোটা-মোটা দাগ টানতে লাগলো।

সরকার নরম, ভিজা গলায় বল্‌লে,—কিন্তু সেই জীবন আর বেশিক্ষণ নেই। আপনি একবারটি চলুন, বোধ হয় ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই সব শেষ হ'য়ে যাবে।

—সব শেষ হ'য়ে যাবে। শব্দ কয়টা আবৃত্তি করার মতো ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করে' লোকেশ বল্‌লে,—সব তো কবেই শেষ হ'য়ে গেছে। এখন আমি গিয়ে করবো কী? আমার আর কী কাজ?

—মা-ঠাকরুন যে আপনাকে ভারি দেখতে চাইছিলেন।

—তাই বলুন। লোকেশ মুখ তুলে সোজা হ'য়ে বসলো। মুচ্‌কে একটু হেসে বল্‌লে,—কিন্তু আপনার বাবু চিঠিতে সে কথাটা বেমালুম চেপে গেছেন দেখছি। লিখেছেন, দেখুন না এই চিঠিটা: আমার স্ত্রী মৃত্যুশয্যাশায়ী, আপনি আসিয়া দয়া করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব একবার তাহাকে দেখিয়া যাইবেন।

—ও তাই হ'লো, সরকার অস্থির হ'য়ে ঝাঁজালো গলায় বল্‌লে,—এতো বড়ো বিপদের সময় বাবুর ভাষার ভুল ধরবেন না। আপনি চলুন।

চিঠিটা একপাশে সরিয়ে রেখে লোকেশ আবার পেন্সিল নিলে; বল্‌লে,—সীতেশ বাবুর স্ত্রীর কী হয়েছে?

—সে অনেক-কিছু, ভুগছেন আজ প্রায় তিন মাসের ওপর—ডাক্তাররা অনেক সব উদ্ভট নাম বাংলালে, কিন্তু কিছুতেই কিছুর

কিনারা হ'লো না। কাল রাত বারোটা থেকে অবস্থা একেবারে খারাপের দিকে চলে' গেছে, আজ সকালবেলা শ্বাস সুরু হয়েছে দস্তুরমতো।

লোকেশ ঠোঁটের কোণটা আবার কুঁচ্‌কোলো: শ্বাস উঠেছে অথচ স্পষ্ট নাম-ঠিকানা মনে করে' কাউকে দেখতে চাইছে, এ যে দেখছি মশাই অদ্ভুত রুগী। আপনাদের কিচ্ছু ভয় নেই, এ-রুগী ঠিক সেরে উঠবে।

নিদারুণ বিরক্ত হ'য়ে সরকার বল্‌লে,—কথা না-হয় কাল রাত থেকে বন্ধ হয়েছে, কিন্তু তাই বলে' কাউকে দেখবার ইচ্ছাটা আর আগে জানানো যায় না ?

—তাই বলুন। লোকেশ পিঠ সোজা করে' চেয়ারে হেলান দিলো: তা হ'লে অনেক আগে থেকেই আমাকে দেখতে চেয়েছে। আপনার বাবু শেষকালে কিনা আমাকেই দয়া করতে বলছেন। কিন্তু এখন, এই শেষ সময়ে গিয়ে আমি কী করবো ? আমায় কে চিনবে ?

—কেন চিনবেন না ? বাবু-ই তো আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ; আমি সঙ্গে করে' নিয়ে গেলে কেন তিনি আপনাকে চিনতে পারবেন না ?

কথাটা যেন ভীষণ উপভোগ করবার মতো—লোকেশ এমনি গভীর সরলতায় গলা ছেড়ে হেসে উঠলো। বল্‌লে,—তা, সঙ্গে না-হয় আমি আমার একখানা ভিজিটিং-কার্ডও নিয়ে যাবো। কিন্তু আমি গেলে কারু কোনো কিছু লাভ হ'বে বলতে

পারেন? আমি প্রোফেশ্যনাল্ মোর্ণার নই, মড়ার খাটে আমি কাঁধও দিতে পারবো না। আর কারু শোকে ধর্‌তাই বুলি পেড়ে সান্ত্বনা দেয়া—Oh horrible, আমি সমস্ত শরীর দিয়ে তা ঘৃণা করি। আপনাদের বিপদের মাঝে আমি গিয়ে করবো কী? ও-সব হৈ-চৈ আমায় পোষায় না, মশাই।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের আপদ-নখ দেহ রাগে, ঘৃণায় থরথর করে' কেঁপে উঠলো। ব্যাপারটা সে কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারলো না। জমিদারি কাজে এতো দীর্ঘ সময় ব্যাপৃত থেকেও এতো বড়ো একটা অমানুষিকতা সে মরে' গেলেও কল্পনা করতে পারতো না। বর্ব্বরতম অপরাধ করে' যে ফাঁসি যায়, সেও বোধকরি মানুষত্বের নামে এর চেয়ে বেশি করুণা দাবি করতে পারে।

ভদ্রলোক কঠিন করে' বল্‌লে,—আপনার সঙ্গে বাজে কথা বলার আমার সময় নেই। আপনি যাবেন কি না বলুন।

—বাজে কথা বলার আমারই কি সময় আছে নাকি? ন'টা প্রায় বাজে, খেয়ে-দেয়ে আমাকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কোর্টে যেতে হ'বে। লোকেশ ড্রয়ার টেনে সিগ্‌রেটের একটা টিন বা'র করলো: কেউ মরছে শুনে সমস্ত পৃথিবী তো মশাই, হাত-পা গুটিয়ে বসে' থাকতে পারে না! একমাত্র মরা-ই তো আর মানুষের কাজ নয়।

ঝুঁকে পড়ে' লোকেশ আবার কাগজপত্র ঘাঁটতে সুরু করলো।

ভদ্রলোক আর দাঁড়ালো না। দরজার কাছে এসে তেতো, রুক্ষ গলায় বল্‌লে,—তা হ'লে বাবুকে গিয়ে বলবো আপনি ফি পাবেন না বলে' এলেন না ?

—আপনার যা খুসি বলতে পারেন। আমার কাজ আগে না বিলাসিতা আগে ?

—ছি-ছি, ভদ্রলোক ততোক্ষণে বাইরে চলে' এসেছে : একজন মরতে বসেছে, সে শত শত্রু হ'লেও তো মানুষে শেষ সময়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ! আর এ কি না একজন শিক্ষিত উকিল—এতো যার নাম-ডাক—ছি-ছি-ছি—

ভদ্রলোক সঙ্গে একেবারে একটা গাড়ি নিয়ে এসেছিলো। ভদ্রলোক উঠতেই গাড়ি ষ্টার্ট দিলে।

এতোদিন ধরে' যাকে সে মনে-মনে ঘৃণা করে' এসেছে, তাকেই যে সে কোনো একদিন সর্ব্বাঙ্গ ভরে' ভালবেসেছিলো, সে কথা লোকেশের নতুন করে' আজ মনে পড়লো। বহু বৎসর পরে জন্মভূমিতে ফিরে আসার মতো যেন মনোরম লাগছে। গুনে' হিসেব করে' দেখলো নীলার বিয়ে হয়েছে আজ ছ' বছর—বিয়ে হয়েছে মানে শরীর নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, লোকেশের প্রেমকে করেছে অপমানিত, প্রত্যাশাকে করেছে রূঢ় অপঘাত। সেদিনের সেই অকালস্বপ্নভঙ্গের পর লোকেশ তার চারপাশে ধীরে-ধীরে পৃথিবীর নতুন পরিবেশ রচনা করলে ; তার প্রেমের তিরোধানের শূন্যতা বিস্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো। প্রথম-প্রথম সে-প্রেম রূপান্তরিত

হ'য়ে উঠলো প্রবলতম ঘৃণায়, পাশবিক প্রতিহিংস্রতায়; সেখানেও সেই সমান উন্মাদনা, সমান দাহ। যা ছিলো মধুর, তা-ই হ'য়ে উঠলো বিষ; যা ছিলো নেশা, তাই হ'য়ে উঠলো মত্ততা। লীলাকে তার জীবন থেকে বাদ দেবার জন্যে সুরু হ'লো তার নতুন সমারোহ—ত্যাগের তীব্রতা। যে বিদায় নিয়ে গেছে, তার ছায়ার প্রহরায় সে জীবন কাটাতে পারবে না—যেখানে যতোটুকু স্মৃতির ধূলিকণা সঞ্চিত হ'য়ে ছিলো, সব সে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে—তার এই বাঁচবার বেগের হাওয়ায়। ছিঁড়লো সব তার চিঠি-পত্র, ভুললো সব তার স্পর্শ ও সামীপ্যের ইতিহাস। মনে-মনে তার নামোচ্চারণ করা পর্য্যন্ত পাপ, রাত্রে তাকে স্বপ্নে দেখলে মনে করতে হ'বে স্বাস্থ্যবিকৃতি। তার জীবন্ত থাকার পরোক্ষ অভিজ্ঞতাটা পর্য্যন্ত অপবিত্র। তার পাতিব্রত্যের চেয়ে সামান্য একটা রূপোপজীবিনীর ধর্ম্মভীরুতায় বেশি সত্য, বেশি নিষ্ঠা! সমগ্র শরীরকে রক্ষা করতে হ'লে এই গলিত প্রত্যঙ্গটা সে অনায়াসে কেটে বাদ দিতে পারবে।

শেষে এই ঘৃণা পর্য্যবসিত হ'য়ে এলো নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে। লীলাকে ঘৃণা করাও যেন তাকে অন্যায় মর্য্যাদা দেয়া, তার বিচ্ছেদকে স্বীকার করে' নেয়া, মানে তার অস্তিত্বকে দেয়া মূল্য! ঘৃণা যেন প্রেমেরই উলটো পৃষ্ঠা, তাই প্রেমের এই প্রতিবেশিতা লোকেশের সহ্য হ'লো না। লীলা হ'য়ে উঠলো মাত্র একটা নাম, তার সঙ্গে তার সম্পর্কটা মাত্র একটা

খবরের কাগজের সংবাদ। লীলার সঙ্গে তার কী ঘটেছিলো না ঘটেছিলো সব যেন একটা মাসিক-পত্রের গল্প। সে বেঁচে আছে কি নেই, তার চেয়ে মোকদ্দমার ফলাফলে লোকেশের বেশি কৌতূহল। সে তার কাজ নিয়ে এতো মশ্‌গুল যে সামান্য একটা বিয়ে করতে পর্য্যন্ত তার সময় হয় নি।

সেই লীলা আজ এতোদিনের অজ্ঞাতবাস কাটিয়ে হঠাৎ লোকেশের সামনে আবির্ভূত হ'লো। তাকে সে দেখতে চায়, চিরকালের জন্যে চলে' যাবার আগে তাকে একটিবার সে কাছে পেতে চায়, তার স্বামীকে দিয়ে সে চিঠি লিখে পাঠিয়েছে।

এই বুঝি—এতোদিনে বুঝি তার প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে।

লোকেশের মনে পড়লো, বিয়ের অনেক আগে লীলার একবার অনেক দিন ধরে' প্রায় একটা মরণান্তক অসুখ হয়েছিলো। লোকেশ ছিলো তখন তার একান্ত কাছে—রাত্রে-দিনে, তার ঘরে, তার বিছানায়। করতো তাকে অজস্র সেবা, একটা দৈত্যের মতো অক্লান্ত, অমানুষিক পরিচর্য্যা। তারপর গভীর রাতে, কিছুতেই যখন তার আর ঘুম আসতো না, লোকেশ ছাদে চলে' আসতো অন্ধকারে আলুলিত আকাশের নিচে। মনে-মনে তার প্রার্থনা উঠতো পুঞ্জীভূত হ'য়ে: যে-ঈশ্বর লীলার দেহের অণুতম ব্যাক্‌টিরিয়াম থেকে সুরু করে' বিরাট মহীরুহে পর্য্যন্ত প্রাণক্রিয়া সঞ্চারিত করে' দিয়েছেন, যে-প্রাণ সামান্য পিঁপড়ে থেকে অতিকায় গণ্ডারে,

স্পঞ্জে, শামুকে, সাপে, অক্টোপাস্‌এ, লিচেন্‌ থেকে তিমিতে, মাকড়সা থেকে প্রজাপতিতে, ঘাসে, আগাছায়, চাঁপার কোরকে —লোকেশ সমস্ত দেহ-মন দিয়ে লীলার দেহে কামনা করতো সেই প্রাণ, সেই দ্রুত তীক্ষ্ণ স্পন্দমানতা। ঈশ্বরের কাছে সে আর কিছু ভিক্ষা করতো না, শুধু লীলা বেঁচে উঠুক, মাত্র শরীরে বেঁচে উঠুক, এই ছিলো তার আপ্রাণ প্রার্থনা। লীলার কাছে কিছুই যেন তার আর চাইবার নেই—শুধু তার দেহে থাক্‌ প্রাণবহনের দীপ্তি, মাত্র একটা যান্ত্রিক ছন্দোবদ্ধতা। আর সে কিছু চায় না, লীলা শুধু বেঁচে উঠবে, আবার খিল্‌খিল্‌ করে' হাসবে, ঘরে-বারান্দায় ছুটোছুটি করে' বেড়াবে, সেতার বাজাবার সময় আধখানা শরীর এলিয়ে তেমনি পা বেঁকিয়ে বসবে। আবার তেমনি পিঠে ভেঙে পড়বে খোঁপার স্তূপ, শরীরের রেখায়-রেখায় পিছলে পড়বে লাবণ্য। আর সে কিছু চায় না, শুধু লীলা বেঁচে উঠুক। তার চেয়ে বড়ো কীর্তি যেন লীলার আর কিছু থাকতে পারে না। আকাশের সীমান্তে প্রতি রাত্রে যেমন একটি তারা জেগে থাকে, তেমনি পৃথিবীর এক প্রান্তে সে বেঁচে থাকলেই যেন যথেষ্ট।

সত্যি-সত্যি, তার সেবায় হোক্‌, প্রার্থনায় হোক্‌ লীলা বেঁচে উঠলো, কিন্তু তার প্রেম গেলো মরে'। চোখের জল ও মুখের হাসিতে জীবনের একটা প্রান্তে বিচিত্রিত রামধনুর মতো ক্ষণকাল জেগে থেকে মিলিয়ে গেলো সে বিস্মরণের অন্ধকারে।

সেই থেকে সজ্ঞান সচেষ্টতায় লীলাকে সে এড়িয়ে চলেছে স্বচক্ষে কোনোদিন দেখেনি তার মুখ, যার ললাটে কলঙ্কবিন্দুর মতো সিন্দুর হয়েছে অলঙ্কার, স্মৃতিতে করেনি তার ধ্যান যার নামের আবহাওয়ায় পর্য্যন্ত দুর্গন্ধ পঙ্কিলতা। কিন্তু, আশ্চর্য্য, তবু সে লোকেশকে ভোলে নি, তার অস্তিত্বের অন্তরালে কঠিন কঙ্কালের মতো সে সেই অতীতকে আজো পর্য্যন্ত লালন করে' এসেছে: আজ কিনা সমস্ত অন্তরাত্মা অনাবৃত করে' তাকে সে একবার দেখতে চাচ্ছে! মরতে বসেছে বলে' ভেবেছে, এই এক কণা করুণা থেকে হয়তো সে বঞ্চিত হ'বে না।

লোকেশ হাঁক দিলো: বিনোদ।

স্তোফার হাজির।

—গাড়ি বা'র করো শিগ্‌গির, আমাকে এক্ষুনি একটু বেরোতে হবে। হ্যাঁ, ঠিকানা? লোকেশের মুখ-চোখ ত্রস্ত, বিমর্ষ হ'য়ে উঠলো: ঠিকানা জেনে রাখিনি তো? কী হ'বে? লোকটা একটা bluff দিয়ে গেলো নাকি?

বিনোদ বল্‌লে,—যে-লোকটা গাড়ি করে' একটা চিঠি নিয়ে এসেছিলো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিঠি। চিঠিতে নিশ্চয়ই ঠিকানা আছে। এই যে—সেই টালিগঞ্জ। মুদিয়ালি রোড। চেনো? তবে তৈরি হ'য়ে নাও চট্‌পট্, আমি আসছি ওপর থেকে।

উপর থেকে লোকেশ দস্তুরমতো সাজগোজ করে' এলো—

বিয়ে-বাড়িতে সে যেন নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছে। পাঞ্জাবির ঢিলে হাতা আর লুটোনো লম্বা কোঁচায় তার পরিপাটি শৈথিল্য, ঘন করে' চুল ফেরানো, পায়ের জুতো আয়নার মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। কতোদিন পরে লীলার সঙ্গে আবার তার দেখা হ'বে।

নিচে, ড্রয়ার খুলে সিগ্‌রেট-কেস্‌এ সে সিগ্‌রেট ভরে' নিচ্ছে, বিনোদ দেখা দিলো।

—চলো, ঠিকানা মনে আছে তো?

গাড়ি ট্রাম-ডিপো পার হ'য়ে চললো আরো দক্ষিণে। লোকেশ বল্‌লে,—টার্ন নিয়ে সোজা রাস্তার মধ্যে ঢুকে পোড়ো না। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে। কাছাকাছি এলে বোলো।

বিনোদ ক্লাচ টিপে বল্‌লে,—এইবার আর একটু সামনে মুদিয়ালি রোড।

—আচ্ছা, দাঁড়াও।

গাড়ি দাঁড়ালো।

লোকেশ একটা সিগ্‌রেট ধরিয়ে বল্‌লে,—তুমি একবার যাও ও-বাড়ি। চুপি-চুপি কাউকে জিগ্‌গেস করে' খবর নিয়ে এসো ও-বাড়ির গিন্নি-মা'র এখন অবস্থা কেমন! যদি শোনো এখনো প্রাণ আছে, সটান আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, আমার কোর্টের বেলা হ'য়ে গেলো—আমি ওখানে গিয়ে করবো কী?

বিনোদের গলা কেঁপে উঠলো: আর যদি শুনি—

ধোঁয়ায় পর-পর কয়েকটা ring তৈরি করে' লোকেশ বললে—আর যদি শোনো, হ'য়ে গেছে, তা হ'লেও আমাকে এসে তাড়াতাড়ি খবর দেবে। আমি তাকে একবারই দেখবো।

বিনোদ সাত-পাঁচ কিছু অনুধাবন করতে না পেরে আস্তে-আস্তে বাড়ির সন্ধানে বেরিয়ে গেলো।

একটা সিগ্রেট পুড়তে প্রায় সাত-আট মিনিট সময় লাগে—বিনোদ তার মধ্যে ফিরে এলো না। নিশ্চয়ই এখনো প্রাণ যায় নি, তাকে তা হ'লে সোজা বাড়িই ফিরে যেতে হ'বে আর-কি। শেষকালে সমস্ত আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়ে একটা মরণোন্মুখ নারীর কাতরোক্তিতে মুগ্ধ হ'য়ে সে লীলার চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, আর তার এই পৌরুষের পরাজয় দেখে লীলার নিষ্প্রভ চক্ষু হঠাৎ তৃপ্তির জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে—এ অসম্ভব। ফিরেই সে যাবে ঠিক, তার একটা পার্ট-হার্ড কেস্ আছে, পরের একটা তুচ্ছ খেয়ালের জন্যে সে তার কর্ত্তব্যে অবহেলা করতে পারে না। কিন্তু লোকেশ আরেকটা সিগ্রেট ধরালো, এতো দূর এসেও যদি লীলাকে তার দেখবার সুযোগ না হয়,—না, ঐ বিনোদ এসে পড়েছে।

—কী, বাড়ি পেলে খুঁজে? কী খবর? আছে কেমন?

খবরটা এমন নয় দশ-বিশ গজ দূর থেকে তা চেঁচিয়ে বলা যায়। বিনোদ লোকেশের ঘনিষ্ঠ হ'য়ে দাঁড়ালো; ভারি, ম্লান গলায় বললে,—এই খানিক আগে মারা গেছেন।

—যাক্। যেন বুক থেকে কঠিন একটা পাথর নেমে গেছে

এমনি স্বচ্ছন্দ চাঞ্চল্যে লোকেশ মোটরের দরজাটা খুলে ফেললো। ফুটপাথে নেমে এসে বল্‌লে,—কী করে' টের পেলে?

'স্তম্ভিতের' মতো লোকেশের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বিনোদ বল্‌লে,—তুমুল কান্নাকাটি পড়ে' গেছে।

লোকেশ চাপা গলায় প্রায় একটা গর্জ্জন করে' উঠলো: বোকা! সে তো মরবে ভেবেও বাড়ির লোকেরা কান্নাকাটি করতে পারে। পৃথিবীতে কান্নার কিছু দুর্ভিক্ষ আছে নাকি?

—না, আমি একজনকে জিগ্‌গেসও করেছিলাম—এতো কান্নাকাটি কিসের? সে বল্‌লে, আধঘণ্টাটাক্ আগে এ-বাড়ির বড়ো গিন্নি আজ মারা গেলেন।

—যাক্। লোকেশ যেন আরো হাল্‌কা হ'লো। কোঁচাটা বার দুই ঝেড়ে সে বল্‌লে,—তুমি তা হ'লে গাড়িতে বোসো, আমি গিয়ে একটিবার তাকে দেখে আসছি। কদ্দূর যেতে হ'বে বলো দিকি?

— বেশি নয়, বাঁ হাতি দু' তিনটে বাড়ির পরেই। গাড়িতেই চলুন না।

—না, গাড়ি লাগবে না। তেল লাগলে মোড়ের দোকান থেকে গ্যালন দুই নিয়ে নাও চট্ করে'। আমি আসছি।

দরজার সামনে যারা ভিড় করে' দাঁড়িয়ে ছিলো, সম্ভ্রান্ত আগন্তুক দেখে তারা একসঙ্গে পথ ছেড়ে দিলো। তাদের মুখের চেহারা দেখে লোকেশের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না যে পরমতম ঘটনাটা নির্ব্বিঘ্নে ঘটে' গেছে। কে কী ভাবলো কে

জানে, সিঁড়ি গুনে'-গুনে' লোকেশ উপরে উঠে এলো, অর্দ্ধদগ্ধ সিগ্রেটটা সামনে যে জানলা পেলো, দিলো তার বাইরে ছুঁড়ে। বারান্দা পেরিয়ে, কান্নার উত্তালতা পরিমাপ ক'রে'-করে' সে একেবারে লীলার শোয়ার ঘরে ঢুকে পড়লো।

বহু লোকের জটলা চলেছে, ঘরের মধ্যে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে শোকের তরঙ্গ। তার মধ্যে খাটের উপর স্তূপীকৃত বিছানা-বালিসের মাঝখানে অপরিমাণ নিঃশব্দতার সমুদ্র নিয়ে লীলা শুয়ে আছে। সেই লীলা! লোকেশ এক পা দু' পা করে' খাটের কাছে এগিয়ে এলো। নিজের-নিজের শোক নিয়ে সবাই এতো বিভোর, কেউ তাকে বিশেষ লক্ষ্য করলো না। মৃত্যু আজ যেন সকল দুয়ার অবারিত করে' দিয়েছে।

সেই লীলা। লীলার মৃত্যুর উদ্দেশে তাকে যদি একটা ফরমায়েসি কবিতা লিখতে হ'তো তো তাকে সে অনায়াসে তুলনা দিতো নিরুত্তর এক নদীতটের সঙ্গে। তার আজকের এই পৃথিবীময় অকূল চিহ্নহীনতার যেন তুলনা নেই। একদিন তার মন থেকে সে মুছে গিয়েছিলো, আজ গেলো দেহ থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে। পৃথিবীতে কোথাও আর সে নেই, পৃথিবীর বাইরে সৌরজগমণ্ডলে কোনো দূরতম গ্রহ-তারায়ো নেই এই পার্থিব প্রাণের পরিচয়; নিঃশেষে সে থেমে গেছে, ফুরিয়ে গেছে, শূন্য হ'য়ে গেছে। লীলার কাছে তার যেন এইটুকুই পাওনা ছিলো,—বাকি ছিলো লীলার শুধু এই শেষ উদ্ঘাটন। গভীরতম তৃপ্তিতে লোকেশের সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো, নিরর্থকতার এতো বড়ো

একটা সুন্দর পরিণতি সে যেন এর আগে কোনো দিন কল্পনা করতে পারতো না।

নীরক্ত বিবর্ণতা—লীলা মাত্র তার কঙ্কাল নিয়ে শুয়ে আছে, আর তার প্রাণহীন, তাপহীন, রুক্ষ চুলের মধ্যে মুখ গুঁজে কে-একজন—এই হয়তো সীতেশ—অসহায় শিশুর মতো কান্নায় উঠছে ফুঁপিয়ে। মৃত্যুর কাছে তার এই শোক যেন কতো বড়ো লজ্জার, মৃত্যুর কাছে তার প্রেমের এই পরাজয় যেন কতো হীন, কতো অপৌরুষেয়। অন্তরতম আনন্দে লোকেশের সমস্ত রক্তস্রোত যেন তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, মুখে ফুটে উঠলো সেই আনন্দের উদ্দীপ্ত নৃশংসতা। লীলার স্বামী দেখছে মৃত্যু, সে দেখছে অবিনশ্বরতা। লীলা নেই, তার অর্থ লোকেশের জীবনের অনপনেয় কলঙ্ক হয়েছে অপসারিত, তার পরাভবের, তার ব্যর্থতার। লীলা নেই, তার অর্থ সে আজ মুক্ত, অ-সীমাবদ্ধ, ফিরে পেয়েছে সে যেন তার হৃত ঐশ্বর্য্য, লুপ্ত প্রতিষ্ঠা। লীলার কাছে তার পরিচয়ের মাত্র এইটুকুই ছিলো বাকি, একজনের অভাবে এতোদিনে চারদিকে তার উপচে পড়ছে চিত্তের পূর্ণতা। লীলা যে এতো সুন্দর, এতো রমণীয় যে তার মৃত্যুর মালিন্য, তার চিরস্থায়ী নিস্তব্ধতা, তার নিঃশেষ অপসরণ, এ-কথা লোকেশ নিজেই এতোদিন উপলব্ধি করে নি। আজ তাই তার অহঙ্কারের অন্ত পাওয়া ভার—লীলা আর নেই তার পরিচয়কে খণ্ডিত করতে; সে এতোদিনে দিয়ে গেছে তার পরম প্রতিদান।

কে আরেকজন সীতেশের গায়ের উপর হাত রেখে সজল

কণ্ঠে বল্‌লে,—শত মাথা খুঁড়লেও তো আর তাকে ফিরে পাবে না। ছি সীতেশ, তুমি ছেলেমানুষ নাকি? ছেড়ে দাও এবার লক্ষ্মীটি, অবুঝ হয়ো না। তুমি তো চেষ্টার ত্রুটি করোনি, হাজারে-হাজারে টাকা খরচ করেছ, সহরের নাম করা যেতে পারে এমন কোনো ডাক্তার, কোনো চিকিৎসা বাকি রাখো নি। সাধু-সন্নেসি, যাগ-যজ্ঞ, মানত-হত্যে সব করে' দেখেছ—ভগবান যাকে নেবেন তাকে আর কী করে' ফিরে পাবে বলো? মা ছিলেন আমার সাক্ষাৎ ভগবতী, এমন সতীসাধ্বী মা আমার সেই দিব্যধামে চলে' গেছেন। তার জন্যে শোক করছ কী, সীতেশ?

সান্ত্বনার হাওয়া লেগে সীতেশের শোক-শিখা যেন আরো লেলিহান হ'য়ে উঠলো। খেলনা নিয়ে ছোট ছেলে যেমন আকুলি-বিকুলি করে, তেমনি সে আদর করতে লাগলো সেই নিষ্প্রাণ, মৃন্ময় পুতুলটাকে। এই ভেবেই তার দুঃখ আজ অসীম যে, যে-দেহ ছিলো একদিন যৌবনে বিহ্বল, লাস্যে তরঙ্গায়িত, তাপে প্রাণে রোমাঞ্চে অরণ্যের মতো শিহরায়মান, তা আজ এতো কুৎসিত, এতো বীভৎস হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু লোকেশের তাতে একবিন্দু সমবেদনা নেই। সে দেখছে যে-দেহ ছিলো এতোদিন বিশ্বাসঘাতকতায় কলঙ্কিত, যান্ত্রিক একটা অভ্যাস-পালনে জড়ত্বপ্রাপ্ত, ক্ষুধায় কামনায় আরামে আমোদে কলুষ-ক্লিষ্ট, তা আজ মৃত্যুতে কতো সুন্দর, কতো অবর্ণনীয় ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়ে উঠেছে। লীলা মরলো বটে, কিন্তু ফিরে পেলো সে যেন তার প্রথম

যৌবনের ক্ষণিক মৃত্যুহীনতা। তার মৃত্যুতে আজ লোকেশের মতো কেউ পরিপূর্ণ সুখী নয়।

কে-একটি মহিলা শোকার্ত্ত কণ্ঠে চীৎকার করে' উঠলেন: তোমরা সব কৌটো ভরে' সিঁদুর নিয়ে এসো, নিয়ে এসো আলতার পাতা। বৌমাকে সেই তার বিয়ের বারাণসী-খানা পরিয়ে দাও, হাতে দাও কাজল-লতা। রাজলক্ষ্মী মা-কে আমার আমি নিজ হাতে সাজিয়ে দেবো। ফুল কই, বাগান উজোড় করে' ফুল নিয়ে আসতে বলো, সীতেশ।

লোকেশ আর সেখানে দাঁড়ালো না। যেমনি এসেছিলো তেমনি অলক্ষিতে, একটা সিগ্রেট ধরিয়ে আস্তে-আস্তে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

আর্টিস্ট

দুপুরবেলা দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে শীতের রোদ পোহাচ্ছিলুম, শুনলুম আমার নামে কোত্থেকে এক টেলি এসেছে।

চিঠির মোড়ক না খোলা পর্যন্ত শিহরিত আঙুলের মুখে অর্দ্ধোচ্চারিত প্রত্যাশার ভাষা: টেলির বেলায় সব সময়েই একটা মূঢ়, নিরবয়ব আতঙ্ক।

স্বপ্নেও যা ভাবতে পারি নি। টেলি এসেছে সুদূর লামডিং থেকে। স্বপ্নেও যা ভাবতে পারিনি। চুনী—আমাদের চুনী আসামের জঙ্গলে মাত্র দশ ঘণ্টার ম্যালেরিয়ায় অকস্মাৎ মারা গেছে।

হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলুম। শীতের আকাশে কোথাও যেন আর এক ফোঁটা রোদ নেই। যেন একটা আর্দ্র, আহিম অন্ধকার আমার সমস্ত অস্তিত্বকে সহসা পিষে ধরেছে। অলস, ম্রিয়মাণ রোদে গা ভিজিয়ে খানিক আগে মনে-মনে কবিতার উড়ু-উড়ু, মৃদু কয়েকটা লাইনে কল্পনার তা দিচ্ছিলুম, তারা স্তব্ধতার শূন্যে গেলো হারিয়ে। চুনীর সঙ্গে-সঙ্গে আমার একটি কবিতারো অকালমৃত্যু ঘটলো।

রুদ্রের আবির্ভাব

কী যে করা যায় কিছু ঠিক করতে পারলুম না। চলে' গেলুম রমেশের আপিসে। টাইপ-রাইটারের উপর একসঙ্গে তার দুই হাত চেপে ধরে' বললুম,—ভীষণ দুঃসংবাদ।

—কী? রমেশের আঙুলগুলো আমার হাতের মধ্যে ভয়ে কুঁকড়ে এলো।

পকেট থেকে বের করে' দেখালুম টেলি। আমাদের চুনী আর নেই।

—বলিস কি? রমেশ চেয়ারের পিঠে পিঠটা ছেড়ে দিলো: আমি বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। এমন দুর্দ্দান্ত ছিলো ওর প্রাণশক্তি। হাতের মুঠোটা বাঘের থাবার মতো প্রচণ্ড। দুই চোখে ঝড়ের কালো দীপ্তি। গলায় যেন বাজ ডাকছে। তার মৃত্যুটা যেন সূর্য্যের আকস্মিক নির্ব্বাপনের মতোই অসম্ভব।

—বরং আত্মহত্যা করলেও বিশ্বাস করতুম। শেষকালে ম্যালেরিয়ায় মরে' যাওয়া? রমেশ ভয়ে হেসে উঠলো: কে করেছে টেলি? কে এই অমরেন্দ্র?

—লামডিং-এর কোনো বন্ধু বা আত্মীয় হ'বে হয়তো। সেখানে গিয়ে উঠেছিলো। টেলিটা উলটে-পালটে নাড়াচাড়া করতে-করতে বললুম: পরে চিঠি আসবে লিখেছে।

—কিন্তু লামডিং ও গেলো কবে? এই সেদিনো তো ওকে ম্যানাসক্রিপট্ বগলে করে' কর্নোয়ালিস ষ্ট্রিট ধরে' যেতে দেখলুম।

আর্টিষ্ট

—এই সেদিন, সেদিনো আমার কাছে এসেছিলো ওর একটা গল্পের ইংরিজি অনুবাদ করে' দিতে পারি কি না ; টাকার ভীষণ দরকার, অথচ মাথায় নাকি কিছু নতুন গল্প নেই। অনুবাদটা পেলে বোম্বাই না কোথাকার কাগজ থেকে কিছু পেতে পারে সম্প্রতি। অথচ তার আগেই—

রমেশ দুই হাতে তার টাইপ-রাইটারের চাবি টিপতে লাগলো। বল্‌লে,—টাকা, টাকার জন্তে শেষকালটা কেমন মরিয়া হ'য়ে গেছলো। না হ'য়েই বা উপায় কী। কতো বল্‌লুম কোথাও একটা আপিসে-টাপিসে ঢুকে পড়্‌—সাহিত্য করে' কিছু হ'বে না। যাক্‌, রমেশ আবার চেয়ারে হেলান দিলো : ভাগ্যিস বিয়ে করে' রেখে যায়নি।

—কিন্তু সমস্যাটা তাতে বিশেষ প্রাঞ্জল হয়েছে বলে' মনে হয় না। বল্‌লুম : বিধবা মা, তিনটি ছোট বোন, বড়োটির প্রায় বিয়ের বয়স, এক দাদা আছেন—ট্র্যাম-য়্যাক্‌সিডেণ্টে আজ বছর দুই ধরে' প্যারালিটিক, বিছানায় শোয়া—তারো আছে ক'টি ছেলে-পিলে, সমস্ত সংসার ছিলো চুনীর মাথার ওপর। সমস্ত সংসারে শুধু ওই ছিলো রোজগেরে—লিখে-টিখে যা পেতো এদিক-ওদিক। এখন কী উপায় যে হ'বে কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

রমেশ বল্‌লে,—বাড়িতে জানে ?

—কী করে' জানবো ? বোধ হয় নয়। বোধ হয় আমাকেই গিয়ে বলতে হ'বে। আপাদমস্তক শিউরে উঠলুম : তুইও আমার সঙ্গে যাবি, রমেশ।

—কিন্তু আগে খোঁজ নেয়া দরকার। অমরেন্দ্র না-কা'র আগে সবিস্তারে চিঠি আসুক। কোনো শত্রুর কারসাজি নয় তো? রমেশ চেয়ার থেকে হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো: আমি যে কিছুতেই মেনে নিতে পাচ্ছি না, চুনী আর নেই—আমাদের সেই চুনী।

বিশ্বাস করা এমনিই শক্ত। টেলির আঁকাবাঁকা নীলচে ক'টি অক্ষর ছাড়া আর কোথাও এর বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। স্পষ্ট দিবালোকে পৃথিবী তার অভ্যস্ত প্রাত্যহিকতায় প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে।

বল্‌লুম,—মানুষের মৃত্যুটা সবসময়েই ভীষণ সত্যবাদী। তার আকস্মিকতাতেই সে বেশি বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু এখন কী করা যায়? ওর মা'র কাছে গিয়ে কী করে' এই খবর দেবো?

—দাঁড়া, ভেবে দেখি। আমিও তোর সঙ্গে যাবো। রমেশ আমার হাত ধরে' টান মারলো: চল্ টিফিন-রুমে। দু' কাপ্ আগে চা খেয়ে নিই। গলাটা আমার শুকিয়ে আসছে।

রমেশকে নিয়ে সন্ধ্যাসন্ধিতে চুনীদের বাড়ি গেলুম। নোংরা, অন্ধ একটা গলির শেষ-প্রান্তে, তা-ও ভিতরের দিকে, দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছোট, নিচু একটা গর্ত। শীতের সন্ধ্যায় সঁ্যাতসঁ্যাত করছে। এ-বাড়ির বাতাস কোনোদিন যেন রোদের মুখ দেখে নি। অন্ধকারটা যেন কালো মস্ত একটা মরা পাখির মতো তার ভারি পাখায় ঘর জুড়ে পড়ে' আছে।

খানিকক্ষণ দাঁড়াতেই চোখ একটু সহজ হ'য়ে এলো।

আর্টিষ্ট

ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ এলো : কে?

—আমি, আমি প্রসাদ। আর সঙ্গে এই আমার একটি বন্ধু।

কাঁথার তলা থেকে চুনীর মা উঠে এলেন। বয়সে যতো নয়, দারিদ্র্যে গেছেন দীর্ণ হ'য়ে। বল্‌লেন,—এসো, এসো, তোমাদের কাছেই খবর পাঠাবো ভাবছিলুম। চুনী কোথায় গেছে বলতে পারো?

শুকনো একটা ঢোঁক গিলে বল্‌লুম,—কেন, চুনী বাড়ি নেই?

—কল্‌কাতায়ই নেই। তিন দিন হ'লো, গেলো-বেস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা আমার সঙ্গে ঝগড়া করে' বাড়ি থেকে সেই যে বেরিয়ে গেলো ঝড়ের মতো, আর তার কোনো পাত্তাই নেই। তোমাদের সঙ্গে ওর দেখা হয় নি?

—না তো। অনেক দিন দেখা নেই বলে' আমরাই বরং ওর খোঁজ নিতে এসেছিলুম। কোথায় গেছে কিছুই বলে' যায় নি?

—সে ছেলে আবার বলবে! মা অবহনীয় দুর্ব্বলতায় মেঝের উপর বসে' পড়লেন: যা মুখে এলো তাই না আমাকে বলে' পাগলটার মতো বেরিয়ে গেলো। তারপর একটি বারের জন্যেও এ-মুখো হ'বার নাম নেই। সামান্য একটা চিঠি পর্য্যন্ত নয়। মা হঠাৎ কান্নার অসহায়তায় ফুঁপিয়ে উঠলেন : আমি তো তোমাদের দেখে ভাবছিলুম তোমরা আমার চুনীর কিছু খবর নিয়ে এসেছ।

গলাকে যথাসম্ভব তরল রাখবার চেষ্টা করলুম। বল্‌লুম,—আমার সঙ্গে কম-সে-কম প্রায় দুই হপ্তা দেখা নেই। নতুন এক

কাগজ বেরুচ্ছে, তাই ওর একটা লেখা চাইতে এসেছিলুম। তা—ও হঠাৎ আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলো কেন?

—আর বোলো না। মা'র কান্না এবার শব্দে প্রতিহত হ'তে লাগলো: বাড়িওলা সেদিন বাড়ি বয়ে' এসে আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে' গেলো, ওকে বলেছিলুম তার একটা প্রতিবিধান করতে। ও খেপে উঠে বল্‌লে, বাড়িওলাকে ও এক্ষুনি গিয়ে খুন করে' আসবে। আমি টিটকিরি করে' বলেছিলুম, ওর ন্যায্য টাকা দিতে পারিস না, আবার মুখ করিস কা'র ওপর? করবেই তো তাকে অপমান যে ঠাট করে' মাসের পর মাস পরের বাড়িতে থাকবে অথচ ভাড়ার টাকা গুনতে পারবে না। তার আবার কিসের মা, কিসের কী? এই না বলা, আর ছেলের সমস্ত রক্ত গেলো মাথায় উঠে। দু'হাতে জিনিস-পত্র ভেঙে-চুরে ছত্রখান করে' দিয়ে যা মুখে এলো তাই আমাকে বলতে-বলতে রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে গেলো।

গলায় হাসির আমেজ এনে বল্‌লুম,—কী বললে?

—সে আমি মুখে আনতে পারবো না। মুখে ওর কোনোদিন কিছু বাধে নাকি?

—না বলুন, আমাদের বলতে কী বাধা?

মা দুই হাঁটুতে মুখ ঢাকলেন: বললে, 'পারবো না, পারবো না আমি এই গুষ্টি গেলাতে। আমি কে, আমার কী, আমি কেন তোমাদের সবাইকে খাওয়াতে যাবো? আমি একা, আমাকে সবাই মিলে তোমরা বাঁচতে না দাও, আমার মরণ তোমরা কী করে' বন্ধ

করতে পারবে? আমি মরবো, আমি মরবো', মা কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলেন: যা মুখে এলো তাই বলতে-বলতে ঝড়ের মতো গেলো বেরিয়ে। ভাতের থালাটা পর্য্যন্ত ছুঁলো না।

ঘরের মৃত, ঠাণ্ডা অন্ধকার মুখের উপর প্রেতায়িত নিশ্বাস ফেললে। অন্ধকারে যেন অস্তিত্বের কোনো সীমা খুঁজে পেলুম না।

পিছন থেকে রমেশ বলে' উঠলো: একেবারে ছেলেমানুষ।

—এমনি ছেলেমানসি আরো কতোবার করেছে, রাগারাগি করে' কতোদিন গেছে ঘর থেকে বেরিয়ে, আবার একটি দিন পুরো যেতে-না-যেতেই কোত্থেকে নিয়ে এসেছে টাকা জোগাড় করে'। এমন করে' একসঙ্গে এতোদিন আমাদের ফেলে রাখে নি। কী যে মুস্কিলে পড়েছি, প্রসাদ, কী বলবো? হাঁড়িতে একটা কুটো পর্য্যন্ত নেই—ছেলেপিলেগুলো কাল থেকে ঠায় উপোস করে' আছে। তোমরা একটু খোঁজ করে' রাগ ভাঙিয়ে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারো? ও নিজেই বা এতোদিন কী করে' থাকতে পারছে চুপ করে'? ও জানে না আমাদের অবস্থা? ও জানে না ও ছাড়া আমাদের গতি কী হ'বে?

রমেশ জিগ্‌গেস করলে: লামডিংএ অমরেন্দ্র বলে' আপনাদের কেউ আছে জানেন?

—অমরেন্দ্র? মা চম্‌কে উঠলেন: কেন? অমরেন্দ্র তো আমার দূর সম্পর্কের বোনপো হয়। লামডিংএ তার মস্ত কাঠের কারবার। কেন, তার কী হ'লো?

—না, কিছু হয়নি। একটা উড়ো খবর শুনেছিলুম, চুনী নাকি দার্জিলিংএ গেছে, সেই অমরেন্দ্রের কাছে।

—পাগল! তার হ'বে আবার সেই সুমতি! অমরেন্দ্র তার কারবারে ওকে নেবার জন্যে কতো ঝোলাঝুলি, পেরেছে ওকে বাগ মানাতে? ব্যবসা বা চাকরি ওর দু' চক্ষের বিষ। ওর তপস্যা হচ্ছে সাহিত্য, খেতে না পাক্, গুষ্টিশুদ্ধ মরুক সবাই মিলে, তবু ও ছাড়বে না ওর নেশা। ওটা ওর কাছে ঠিক ধর্মের মতো। বলে, 'যার যা কাজ মা, যার যা ব্রত। বলে, তুমি বল্‌তে পারো আগুনকে, তুমি পোড়াতে পারবে না, দিতে পারবে না আলো, হ'তে পারবে না লাল? তেমনি মা, আমি। আমার যা করবার তাই আমি করবো, তাই আমি করবো আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে।' ও যাবে দার্জিলিং, অমরেন্দ্রের কারবারে! উদ্বেগে অস্থির হ'য়ে মা আবার উঠে দাঁড়ালেন: তা হ'লে তো অমরেন্দ্রই আমাকে আহ্লাদে একেবারে টেলি করে' খবর দিতো। দার্জিলিংএ যাবে বলে' তোমাদের কাছে ও কিছু বলেছিলো নাকি?

—না, বলেনি ঠিক, তবে হ্যাঁ, শুনেছিলুম যেন কোথায়, এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। রমেশ হাঁপিয়ে উঠলো।

মা আমার হাত দু'টো চেপে ধরলেন: যে করে' পারো ওর একটা খবর এনে দাও আমাকে। আমি এমনি করে' যে আর পাচ্ছি না। এতো দিন ধরে' রাগ করে' থাকবার ছেলে তো ও নয়। ও যে মা'র দুঃখ ভীষণ বুঝতো, সবাইর দুঃখ।

বল্লুম,—না, নিশ্চিন্ত থাকুন, খবর এনে দেবো ঠিক। কোথায় আবার যাবে?

রমেশ তার মনিব্যাগ থেকে দু' খানা দশ টাকার নোট বা'র করলো।

আমি তো অবাক।

রমেশ বল্লে,—এ সামান্য ক'টা টাকা আমি আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। ক'টা দিন চালান যতো দিন না চুনীর খবর পাওয়া যায়।

মা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে গেলেন: না, না, তা কী হয়? চুনী জানলে মনে করবে কী? আবার খেপে যাবে, আবার যাবে বাড়ি থেকে পালিয়ে। ওকে তোমরা চেনো না।

—না, এটা ওকে ওর গল্পের জন্যে অগ্রিম দিয়ে যাচ্ছি মাত্র, ওর গল্প আমাদের চাই-ই। রমেশ নোট দু'টো কোনোরকমে মা'র হাতে গুঁজে দিলো।

খবরটা কিছুতেই ভাঙতে পারলুম না। দু' দিন ধরে' সমস্ত পরিবার ঠায় উপোস করে' আছে।

কিন্তু রমেশের ব্যবহার সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য্য করেছে। বরং কঞ্জুস বলে'ই তার একটু অখ্যাতি ছিলো, বন্ধু-বান্ধবের উদ্দেশে আঙুলের ফাঁকে একটি পয়সাও তার গলতো না। সে কিনা অনায়াসে কুড়ি-কুড়িটে টাকা বা'র করে দিলে। চুনীর ভাগ্য বলতে হ'বে! বেঁচে থাকলে বা বেঁচে থাকতে অবিশ্যি তার উপর আমরা এমন মুক্তহস্ত হ'তে পারতুম না।

অমরেন্দ্রের চিঠির জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। বন্ধুদের মধ্যে একবার ঠিক হয়েছিলো লামডিংএ কাউকে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু সেই দিনই দুপুরে অমরেন্দ্রের চিঠি এসে হাজির। সমস্ত ঘটনাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছে।

রাত্রে খেয়ে-দেয়ে শুতে যাবার আগে প্রায় সাড়ে ন'টার সময় তার জ্বর আসে—দেখতে-দেখতে একশো পাঁচ, ছয়, সাত—জ্বর উঠে এলো মাথায়। যাকে বলে ম্যালিগন্যান্ট্ ম্যালেরিয়া। চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয়নি। ডাক্তার, ইন্‌জেক্‌শান, আইস্‌ব্যাগ—ষ্টেশন থেকে দু'মণ বরফ পর্য্যন্ত আনানো হয়েছিলো। লোকজন, সেবা-শুশ্রূষা—যতোদূর হ'তে পারে। তবু কিছুতেই কিছু হ'লো না। জ্বর নেমে গেলো প্রায় চারটের কাছাকাছি, সঙ্গে-সঙ্গে সব গেলো নিবে, জল হ'য়ে। দশ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ।

তারপর চিঠিতে আনন্দবাজারী ভাষায় অমরেন্দ্র দীর্ঘ এক বিলাপ জুড়ে দিয়েছে। তার সঙ্ক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই, বাঙলা দেশের আকাশ থেকে একটি উদীয়মান, উজ্জ্বলন্ত নক্ষত্র হঠাৎ খসে' পড়লো। তার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্যে তার সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবদের অবহিত হওয়া উচিত। বাঙলা-সাহিত্যের যা ক্ষতি হ'লো—সে আরেক শোকাবহ, দীর্ঘ বক্তৃতা। অমরেন্দ্রের কারবার এখন ভারি মন্দা, চারদিক দেখতে-শুনতে হচ্ছে, তাই এই দুঃসময়ের সময় মাসিমার সঙ্গে এসে সে দেখা করতে পারছে না। তবে চুনীর জন্যে কোনো মেমোরিয়্যাল ফাণ্ড তৈরি হ'লে সে একুনে একশো টাকা দিতে রাজি আছে।

মনে-মনে হাসলুম। চুনী আজ নেহাৎ মরে' গেছে বলে'ই, তোমার ব্যবসার মন্দায়মান অবস্থা সত্বেও, তুমি এক কথায় একশো টাকা দিতে রাজি হ'য়ে গেলে। কিন্তু যতোদিন ও বেঁচে ছিলো, ততোদিন ভুলেও হয়তো একখানা পোষ্টকার্ড খরচ করে' ওর খবর নাও নি। বাঙলা-দেশের আকাশ থেকে একটা তারাই খসেছে বটে। সে-খবরটাই শুধু পেলে, কিন্তু কখন সেটা উঠেছিলো বলতে পারো?

চুনীলালের জীবনের সমস্ত ছবিটি আজ আমার মনে পড়লো। সে সেই জাতের সাহিত্যিক ছিলো না যারা পয়সার জন্যে জনসাধারণের মুখ চেয়ে সাহিত্যকে জার্নালিজ্‌মের পর্য্যায়ে নিয়ে আসে। তাতে তার নিজের তৃপ্তি কী হ'তো ছাই কে জানে, পয়সা হ'তো না। এ-পর্য্যন্ত কেঁদে-ককিয়ে বই লিখেছে সে মোটে পাঁচখানা—তাও প্রকাশকের ফরমায়েসে নয়, নিজের তাগিদে, বই ছাপাতে তার তাই বেগ পেতে হ'তো ভীষণ, জনসাধারণের কথা না বলে' সে নিজের কথা বলবে—এই আস্পর্দ্ধার জন্যে তাকে দাম বলে' যা নিতে হ'তো, সেটাতে তার কাগজ ও কালির দাম উঠে আসতো কিনা সন্দেহ। অথচ সে আমার মতো শীতের রোদে ইজিচেয়ারে আধখানা শুয়ে কবিতায় গলে' যেতে বসেনি, নেমে এসেছিলো সে গদ্যের রূঢ় বন্ধুরতায়। তবু কেন যে সে বেশি লিখছে না, লেখাটাকে বুদ্ধিমানের মতো করে' তুলছে না একটা অর্থোপার্জ্জনের বিদ্যা, সেটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য ছিলো। জিগ্‌গেস করলে বলতো, কী লিখবো, কা'দের জন্যে লিখবো?

মূর্খ পাবলিকের বুদ্ধির সমতলতায় সে নেমে আসতে পারেনি, তাই তার উপর ভাড়াটে, ছুটো সমালোচকরা প্রসন্ন ছিলো না। আর চুনীলাল লিখেই খালাস, একবার চেয়েও দেখতো না বইয়ের সম্পর্কে আর তার কোনো কর্তব্য থাকতে পারে কিনা। বইয়ের কাটতির জন্যে বিজ্ঞাপন লেখার কসরৎও যে সাহিত্যেরই একটা অঙ্গ, সে বিষয়ে তার অজ্ঞান ছিলো অভ্রভেদী। ঘরে-বাইরে, এখানে-ওখানে, নিজে নিজের বইয়ের ঢাক পেটাবার সূক্ষ্ম কৌশলটা এতোদিনেও সে আয়ত্ত করতে পারেনি। বন্ধু-বান্ধব ধরে' কী করে' সভা-সমিতি ডাকানো যায়, কী করে' আদায় করা যায় প্রোফেসারদের সার্টিফিকেট, কারু কোনো অসংলগ্ন মৌখিক উক্তিকে কেমন ছলনা করে' ছাপার অক্ষরে টেনে আনা যায়—সাহিত্য-ব্যবসায়ের এ সব প্রাথমিক আবালবৃদ্ধজ্ঞেয় নীতি সম্বন্ধে সে ছিলো একেবারে নিশ্ছিদ্র। তবুও তাকে কিনা আসতে হয়েছিলো এই সাহিত্যে—এই সাহিত্যিক উপজীবিকায়! নিয়তির সামনে তার পুরুষকার পারলো না টিঁকতে।

চুনীর মৃত্যুর খবরটা পরদিন দৈনিক কাগজে সসমারোহে ছাপা হ'য়ে গেলো! আজ আর কেউ চুনীকে প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত নয়; একজন তরুণ বাঙালি সাহিত্যিক অকালে তিরোধান করলো, খবরের কাগজের দপ্তরে সেটা একটা মস্ত খবর। তার দাম আছে। তার জীবনের না থাক, মৃত্যুর তো বটেই। কোনো-কোনো কাগজ তার উপরে প্যারাগ্রাফ পর্যন্ত' লিখেছে। বাঙলা-ভাষার

ক্ষতি কষতে গিয়ে শোকের উৎসাহে বাঙলা-ভাষাকে আর তারা কেউ আস্ত রাখে নি।

দৈনিক কাগজ নিবে গিয়ে ক্রমে মাসিক-কাগজের দিন এলো। নানা জায়গা থেকে আমার কাছে চিঠি আসতে লাগলো চুনীলালের কোনো অপ্রকাশিত লেখা বা ফটো এনে দিতে পারি কি না। ওদের বাড়ির সেই অন্ধকার গর্ত্ত হাতড়াতে-হাতড়াতে কয়েকটা লেখা বা'র হ'লো: খুচরা তিনটে গল্প, আর ছেঁড়া-খোঁড়া একটা নাটিকা। মা বাক্স থেকে তার কিশোর-বয়সের স্বকুমার একখানি ছবি খুলে দিলেন। চুনীলালের শেষ সম্পত্তিগুলি নিয়ে সম্পাদকদের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

সম্পাদক দামিনীভূষণ চুনীর জীবদ্দশায় তার উপর প্রায় খড়্গাহস্ত ছিলেন। কিন্তু আজ মৃত্যু তার স্মৃতির উপর অপরিম্লান একটি মহিমা এনে দিয়েছে। মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখাচ্ছে তাকে আজ তার যথার্থ অনুপাতে। আজ তাকে মূল্য দিতে কারু কোনো লোকসান নেই, কেননা সে-মূল্য সে আর নিজ হাতে নিতে আসছে না। তাকে প্রশংসা করতে আজ আর কিসের লজ্জা, কিসের ভয়, যখন সে নিঃশেষে মরে' গেছে। মৃত্যুর মতো নিশ্চিন্ত আর আছে কী?

পৃষ্ঠায় যে-গল্পটি সব চেয়ে বড়ো দামিনীভূষণ সেটি গ্রহণ করলেন। একবার পড়ে' পর্য্যন্ত দেখলেন না। তার দরকারো ছিলো না। চুনীলালের লেখাটা তাঁর কাগজে আজ একটা মস্ত বিজ্ঞাপন—সেটা তিনি ব্যবসায়ী চোখে সহজেই ধরতে

পেরেছেন। আজ তার লেখা ছাপায় চুনীলালের দরকার নেই—দরকার দামিনীভূষণের। বলা বাহুল্য প্রায় অর্থনৈতিক নিয়মেই দামটা একটু বেশি চাইলুম। দামিনীভূষণ এক কথাতেই রাজি, আমার মতের জন্যে অপেক্ষা না করে' সটান একটা পঞ্চাশ টাকার চেক্ কেটে দিলেন।

বল্লেন: ওঁর বিপন্ন, দরিদ্র পরিবারের কথা ভেবেই সংখ্যাটা একটু ভদ্র করলুম। দামিনীভূষণের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চারপাশের কৃপাজীবীর দলও মমতায় দ্রবীভূত হ'য়ে এলো। আলোক গদগদ হ'য়ে বল্লে,—কিন্তু এ-টাকায় বড়ো জোর একমাস চলতে পারে। তারপর? দামিনীবাবুর মতো স্বজন-বৎসল লোক তো আর বেশি নেই বাঙলা-দেশে।

বল্লুম,—না, আমরা একটা চুনীলাল-মেমোরিয়াল ফাণ্ড খুলবো ভাবছি।

—খুলুন, দামিনীভূষণ সহসা সামনের টেবিলের উপর একটা ঘুসি মারলেন: একশো বার খোলা উচিত। এই নিন্, আমিই দিচ্ছি প্রথম চাঁদা। বলে' বুক-পকেট থেকে মনিব্যাগ খুলে আমার দিকে দশ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিলেন।

কৃপাজীবীদের কেউ-কেউ করুণ, মৃত্যুম্লান চোখে দামিনীভূষণের দিকে চেয়ে রুইলো। কেউ-কেউ উল্লাসে ঢলে' পড়ে' বল্লে: কী উদার, কী মহান!

চুনীলালের মৃত্যুতে দামিনীভূষণের উদারতার চমৎকার

একটা সুযোগ পেয়েছেন বটে। ভাগ্যিস সে মরেছিলো, নইলে তাঁকে এমন মহৎ বলে' হয়তো আমরা দেখতে পেতুম না।

দামিনীভূষণ আর্দ্র গলায় বল্লেন,—আমি শেষ পর্য্যন্ত বিচার করে' দেখলুম, চুনীবাবুর লেখা এমন কিছু নিন্দনীয় ছিলো না। শুধু কাগজের পলিসির জন্তেই তাঁকে রাইট্-য়্যাণ্ড-লেফট্ গাল দিতে হয়েছে। মানুষ না মরলে তাকে আমরা বুঝতে শিখি না কখনো। কী বলো হে রাজেন?

—আমিও তোমাকে এতোদিন এই কথাই বলবো-বলবো করছিলুম। বাবড়ি চুলে উদাস একটি ছোকরা গুন্গুনিয়ে বলে' উঠলো।

চুনী নিতান্ত আর বেঁচে নেই বলে'ই আজ তার এতো সৌভাগ্য।

বাকি লেখা দু'টোও উঁচু দামে অতি সহজেই বেচে এলুম। এই মহড়ায় থিয়েটার খুব ভালো জমবে মনে করে' তার সেই নাটিকাটিও পেশাদার এক থিয়েটার-পার্টি কিনে নিলো।

আশ্চর্য্য, স্বপ্নেও কেউ যা কখনো ভাবতে পারি নি। আজ আর তার সমালোচনার কথা উঠতেই পারে না, বেরুতে লাগলো কেবল উচ্ছ্বসিত, উলঙ্গ প্রশংসা। দামিনীভূষণের কাগজে রাজেন সংস্কৃত-বহুল গম্ভীর বাঙালায় 'সাহিত্যে চুনীলালের বিদ্রোহ' সম্বন্ধে জাঁকালো, প্রকাণ্ড এক প্রবন্ধ বা'র করলে। (পৃষ্ঠা গুনে সে দাম পাবে অবিশ্যি।) তার দেখাদেখি, এইটেই নূতনতম ফ্যাসান ভেবে, আর-আর

কাগজও সুর মেলালো। চুনীর বইগুলি কাটতে লাগলো প্রায় হু-হু শব্দে, দু' মাসে বইটার প্রায় এডিসন্ হয়! যে-বইটার সে কপি-রাইট্ বেচে দিয়েছিলো, তার বিক্রয়াধিক্য দেখে প্রকাশক আপনা থেকেই দয়াপরবশ হ'য়ে কিছু মোটা টাকা চুনীর মায়ের নামে ধরে' দিলেন। নাটিকাটাও সেই সঙ্গে জম্‌জমাট হ'য়ে উঠলো।

আজ চুনীলাল নেই! কিন্তু তার বাড়ির অবস্থা এ ক'মাসে বেশ শ্রীমন্ত হ'য়ে উঠেছে। বেঁচে থাকলে শত চেষ্টা, শত সংগ্রাম করে'ও এ-বাড়ির একখানা ইঁট সে খসাতে পারতো না। কিন্তু তার তিরোধানের কল্যাণে সবাই উঠে এসেছে এখন ভালো পাড়ায়, ফাঁকা, রোদালো বাড়িতে। চুনীলালের মৃত্যু সমস্ত পরিবারের পক্ষে প্রসন্ন একটি আশীর্ব্বাদ।

আমিই তার টাকা-পয়সার তদারক করছি—মেমোরিয়্যাল ফাণ্ডটাও আমারই হাতে। বর্ষার নদীর মতো ক্রমশ তা কেবল ফেঁপেই চলেছে—প্রতি সপ্তাহে খবরের কাগজে জমার তালিকাটা দেশের সামনে পেশ করছি। আজ চুনীলালের অনুরাগী ভক্তের আর লেখাজোখা নেই, দূর মফস্বল থেকে অপরিচিততম পাঠক পর্য্যন্ত তার সাধ্যাতীত দিচ্ছে পাঠিয়ে। যতোদিন চুনীলাল বেঁচে ছিলো, কেউ তাকে চিনতো না, আজ তার মৃত্যু সমস্ত দেশের কাছে একটা অনপচেয় ঐশ্বর্য্য। জীবনে সে ছিলো নির্ব্বাক, নির্ব্বাপিত, কিন্তু মৃত্যুতে সে আজ মুখর, অন্ধকারে সে আজ দীপ্যমান। মৃত্যুই আজ তার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন, শ্রেষ্ঠ রচনা।

তার জন্যে আর আমরা কেউ শোক করছি না।

ফাণ্ডের টাকাটা দিয়ে চুনীলালের নামে একটা লাইব্রেরি স্থাপনার জল্পনা চলছিলো। এই বিষয় নিয়ে খবরের কাগজে দেশবাসীর একটা মত আহ্বান করেছিলুম, সবাই প্রায় রাজি দেখা গেলো। কেউ-কেউ শুধু বল্‌লে,—সঙ্গে চুনীলালের একটি প্রস্তর-মূর্ত্তিও স্থাপিত করা হোক।

কমিটি থেকে তাই পাশ করিয়ে নিয়ে নিচে একা ঘরে হিসেবের খসড়ার উপর অন্যমনস্কের মতো চোখ বোলাচ্ছিলুম, হঠাৎ দরজার কড়াটা যেন হাওয়ায় নড়ে' উঠলো।

রাত তখন এগারোটার কাছাকাছি। পাড়াটা নিঝুম। আলো নিবিয়ে এবার উপরে শুতে যাবো, দরজার উপর আবার কা'র ভারি হাতের শব্দ হ'লো।

বল্‌লুম,—খোলা আছে। ধাক্কা দিন্।

দরজাটা সজোরে দু' ফাঁক হ'য়ে খুলে গেলো।

চম্‌কে আর্ত্তকণ্ঠে হঠাৎ চীৎকার করে' উঠলুম। মুহূর্ত্তে সমস্ত শরীর শীতের পাতার মতো শুকিয়ে এলো। চারদিক থেকে দেয়ালগুলি যেন হেঁটে-হেঁটে সরে' এসে আমাকে চেপে ধরেছে। পায়ের নিচে মেঝেটা আর খুঁজে পাচ্ছি না।

লোকটা শব্দ করে' চেয়ার টেনে আমার মুখোমুখি বসলে। হাসিমুখে, প্রফুল্ল, পরিচিত স্বাভাবিকতায় বল্‌লে,—অতো ভয় পাচ্ছিস কেন? চিনতে পাচ্ছিস না আমাকে?

চাপা গলায় আবার একটা চীৎকার করতে যাচ্ছিলুম,

চুনীলাল তেমনি তার প্রবল উচ্ছ্বসিত পৌরুষে অজস্র হেসে উঠলো।

বললুম,—তুই, তুই কোত্থেকে ?

—স্বর্গ থেকে বললে বিশেষ নিশ্চিন্ত হ'বি না নিশ্চয়ই। চুনীলাল কোটের বোতামগুলি খুলতে-খুলতে বললে,—আপাততো লামডিং থেকেই আসছি। কতো পেলি ? জমলো কতো আমার ফাণ্ডে ?

তার মুখের উপর রুখে উঠলুম : লামডিং থেকে আসছিস মানে ?

—হ্যাঁ, ফাণ্ডের টাকাটা নিয়ে যেতে এসেছি। বেশ একটা ডিসেণ্ট সংখ্যা হয়েছে বলে' মনে হচ্ছে। বলে' চুনীলাল আবার শূন্যতা কাঁপিয়ে হেসে উঠলো : বেশ পাবলিসিটি করেছিস, প্রসাদ। আমিও তাই আশা করছিলুম। ব্যবসায় বেশ মাথা খুলেছে দেখছি।

চেয়ারের পিঠে ভেঙে পড়ে' আবার তার সেই পরিতৃপ্ত আলস্য।

তার হাতটা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে' চেপে ধরলুম। হাড়ময়, নীরক্ত হাত নয়, দস্তুরমতো মাংসল, সুস্থ, নধর !

বললুম : এ কী ভীষণ কথা ? তুই না মরে' গেছিস ?

—মরে'ই গেছি তো, নিঃশেষে মরে' গেছি। চুনীলাল পরিষ্কার, প্রখর দাঁতে আবার হেসে উঠলো : আমি তো আর সাহিত্যিক নই, আমি এখন অমরেন্দ্রের কাঠের কারবারে।

ঘুম

যে-চোখে শিব পঞ্চশরের দিকে তাকিয়েছিলেন সেই মৃত্যুনীল চোখের মতো আকাশ। আগুন যেন মুষলধার বৃষ্টির মতো ঝরে' পড়ছে! অবনীশ রাস্তার উপরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এলো। সমস্ত সহর তার বিরাট চলমানতা নিয়ে চিত্রার্পিতের মতো স্থির। রৌদ্রের বিস্তৃত শরীর তার উপর যেন হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছে। কোন দিকে যে যাবে অবনীশ ঠিক কিছু খেয়াল করতে পারলো না। সময়ের ধূলি গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে উড়ে যেতে লাগলো। ঐ যাচ্ছে একটা ট্যাক্সি। ওটাকে দাঁড় করালে হয়। সামান্য হাত তোলবার সঙ্কল্পের আগে সেটা অন্তর্দ্ধান করলে। না, এমনি পায়ে হেঁটেই সে যাবে—আরেকটু না-হয় দ্রুত দমকে। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি, আর সময় নেই—অবনীশ তবু পেভ্‌মেণ্টের উপর শূন্যতার একটা নিশ্চেতন রেখার মতো দাঁড়িয়ে রইলো!

—এই যে, তুমি না?

অন্ধকারে অদৃশ্য পাখির মতো কোথা থেকে কে যেন ডেকে উঠলো।

ঢেউয়ের পরে ঢেউ। আশ্চর্য্য! মুহূর্ত্তে চারদিক এলো যেন ছায়া করে'। শূন্য যেন ভরে' উঠলো ঠাণ্ডা, অস্পষ্ট ধূসরতায়। ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে ট্র্যাম, ও-পারের দোকানটা সাইনবোর্ডে জ্বল্‌জ্বল্ করছে। সব আবার বিচ্ছিন্ন, যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে।

রুদ্রের আবির্ভাব

—এ কী, তুমি কোত্থেকে? অবনীশ এক পা এগিয়ে এলো: তুমি না দিল্লি আছো শুনেছিলাম!

—তবু ভাগ্যি যে শুনেছিলে। হিমানী ক্লান্ত একটু হাসলে, সেই হাসিতে তার শরীরময় রুক্ষ কৃশতাটি যেন বড়ো করুণ দেখালো। বল্‌লে,—দিল্লিতে থাকলে কি আর কলকাতায় আসা যায় না?

—কলকাতায়? অবনীশ যেন চম্‌কে উঠলো।

—হ্যাঁ, এটা কলকাতা নয়? আমি এখন এখানেই চাকরি করছি যে, ইন্‌সিওরেন্সে এ। এই কাছেই বাসা নিয়েছি। হিমানীর দু'টি চোখ যেন সেই কৃশতার আভায় ভিজে উঠলো: চলো না, যাবে?

—এই কাছেই বাসা নিয়েছ? অবনীশ আবার চম্‌কে উঠলো।

—হ্যাঁ, ঐ তো গলিটা দেখা যাচ্ছে। চলো না। তোমার তো এখন আর কিছু কাজ নেই!

—না, কী আর কাজ!

—তবে চলো। হিমানী যেন দেহের বহুদূর স্তব্ধতায় একটা কাতর দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে: কতোদিন পরে কল্‌কাতাকে ফিরে পেয়ে কী ভালোই যে লাগছে, তারপর তোমার সঙ্গে হঠাৎ এই দেখা হ'য়ে গেলো।

—হ্যাঁ, কী-রকম দেখা হ'য়ে গেলো হঠাৎ। শূন্য কণ্ঠে কথাটা আবৃত্তি করে' অবনীশ হিমানীকে অনুসরণ করলে।

প্রেতায়িত ঘুমন্ত একটা ছায়ার মতো তার শরীরে যেন কোনো স্পর্শসহ অস্তিত্ব নেই।

গলির মুখে দু'-একখানা বাড়ি পেরিয়েই হিমানী থামলো। বললে: এই বাড়ি। একটু দাঁড়াও, দরজাটা ভেতর থেকে খুলে দিই।

আশ্চর্য্য, অবনীশ দাঁড়িয়ে রইলো।

—এই যে, এসো। হিমানী দরজা খুলে দিয়েছে!

চৌকাঠটুকু ডিঙিয়ে অবনীশ ঘরে এসে দাঁড়ালো। পরিচ্ছন্ন, নির্ম্মল একটি নিভৃতি ঘরে যেন ঘন হ'য়ে আছে। নতুন চূণকাম-করা খট্‌খটে দেয়ালগুলি যেন বিস্মৃতির মতো সাদা, জানলাগুলি দিয়ে মেঝের উপর, ঘরের জিনিস-পত্রের উপর, হিমানীর গায়ের উপর, টুকরো-টুকরো রোদ এসে পড়েছে যেন নবীন অভিবাদনের হাসি। আবহাওয়াটায় কোথাও একটু অবসাদের ধোঁয়া নেই, নেই এককণা ভয়, নেই এতোটুকু রুগ্নতা। সমস্তটা কেমন একটা মধুর আলস্য দিয়ে তৈরি। স্বচ্ছ নির্লিপ্ততায় সমস্ত শূন্যতা যেন ভাসছে।

বেতের উঁচু-পিঠ-তোলা একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে হিমানী বললে,—বোসো।

—হ্যাঁ, বসি। অবনীশ বসলো, একটু-একটু করে' চেয়ারের কোলে গা ঢেলে দিলে।

হিমানীও ততোক্ষণে আরেকটা নিচু চেয়ার টেনে এনে মুখোমুখি বসেছে। তার অস্পষ্ট সমীপবর্ত্তিতায় স্তব্ধতাটি একটু

উষ্ণ, স্বাদময় হ'য়ে উঠলো। এই কোনো-কথা-না-বলার কোমল অন্ধকারে তাদের দু'য়ের মাঝেকার বিচ্ছেদটি যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

হিমানীই কথা কইলো।

—তোমাকে কেমন যেন ভারি শুকনো, ক্লান্ত দেখাচ্ছে কোনো অসুখ করেনি তো?

—অসুখ? অবনীশ হাসলো, যেন তার শ্রান্তিকেই চিহ্নিত করতে। ডান হাতের আঙুলগুলি মুঠির মধ্যে চেপে আবার তা ছেড়ে দিয়ে বললে,—আমার অসুখ করতে তুমি কবে দেখলে?

—কবে দেখলে মানে? হিমানী শব্দ করে' হেসে উঠলো: আজ প্রায় ছ'বছর পর তোমার সাথে দেখা।

—তাই নাকি? ছ' বছর? এতো? অবনীশ আবার আলস্যে গলে' গেলো: আমি ভাবছিলাম সেই কতোদিন থেকেই তোমার এইখানেই যেন বসে' আছি!

চুপে-চুপে আবার ঘনিয়ে এলো সেই কথা-না-বলার অন্ধকার। অবনীশ হিমানীর গায়ের উপর অন্ধকারের মতোই ঠাণ্ডা, গাঢ় একটি দৃষ্টি ফেললে। তার গায়ের কৃশতাটি বিষাদে যেন ভিজে আছে, তার চারপাশে লেগে আছে যেন ছেলেবেলার ক'টি সন্ধ্যার সুর। তার গায়ের কালো, নরম রঙটি যেন সেদিনকার আকাশের মতো স্নিগ্ধ। তার বসে' থাকার ভঙ্গিটিতে যেন সেদিনের স্পর্শহীন বিশ্রামের শান্তি।

সেদিন। হিমানীর সঙ্গে অবনীশের একটা বিয়ের কথা উঠেছিলো, তারা এসে পড়েছিলো পারস্পরিক প্রশ্রয়ের আকাশে।

কথা উঠেছিলো হিমানীর তরফ থেকে, বলতে কী, অবনীশ-যেন ঠিক ততোটা প্রস্তুত ছিলো না, বরং ছিলো একটু বা ভীত, দ্বিধা-খণ্ডিত। একদিকে ছেলেবেলার এ ক'টি সন্ধ্যার সুর, অন্যদিকে তার কূলহীন ভবিষ্যতের ভার! এমন একটা গুরুতর কাজে নিতে গেলো সে গুরুজনের পরামর্শ—আর কথা নেই, এক কথায় হিমানী বাতিল হ'য়ে গেলো। তার আশে-পাশে কোথাও এতোটুকু রৌপ্যদীপ্তি ছিলো না—না বিভায়, না বৈভবে। অবনীশ তখন বড়োলোকের ছেলে, অভ্রংলিহ আকাঙ্ক্ষাগুলি তখন তার সমস্ত বর্ত্তমান আড়াল করে' দাঁড়িয়েছে। হিমানীকে পর্য্যন্ত তারা মুছে ফেললে! নিষ্ঠুরতা জীবনের একটা স্বাস্থ্য, অবনীশ জীবনের হাওয়া বদ্‌লালো। হিমানী গেলো হারিয়ে, তার সেই অশ্রুসিক্ত, নীরব সন্ধ্যার উপর নেমে এলো রৌদ্রের বিশাল অন্ধকার।

—ভালোই আছো তা হ'লে? হিমানীর প্রশ্নটা যেন হঠাৎ তাকে বিদ্ধ করলে।

—হ্যাঁ, ভালো না থেকে আর উপায় কী? অবনীশ প্রেতগ্রস্তের মতো হাসলো: তারপর তোমার খবর বলো।

—আমার আবার কী খবর! কীই বা তার দাম!

—দাম না থাকাটাই তো তার মূল্য। অবনীশের কথাটা তার গায়ের উপর যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললো: কেমন আছো?

—ভালো। কথাটা যেন হিমানী সমস্ত প্রাণ দিয়ে উচ্চারণ করলে।

—ভালো ?

—হ্যাঁ, চাকরি করছি যে।

—সে তো অনেকদিন থেকেই করছো। আর ?

—আর আবার কী ? শরীরে লঘুতার একটা স্বাচ্ছন্দ্য এনে হিমানী বল্‌লে,—খাই-দাই ঘুমুই, টই-টই করে' ঘুরি, নিজেকে নিয়ে নিজের মাঝে যেন আর আঁটছি না! এতো সময়, এতো কাজ, বাঁচবার এতো জায়গা। সত্যি, বেঁচে যে কতো সুখ, প্রতি মুহূর্ত্তে বেঁচে তা আমরা বুঝতে পারি।

অবনীশ ভয়ে-ভয়ে জিগ্‌গেস করলে: এ-বাড়িতে একা আছো নাকি ?

—না, একা থাকবো কেন ?

চঞ্চল চোখে চারদিক হাতড়ে অবনীশ বল্‌লে,—বাড়িটা ভীষণ খালি-খালি লাগছে, আর কারুর সাড়া-শব্দ তো কই পাচ্ছি না।

—কী করে' পাবে ? মা ভেতরে ঘুমুচ্ছেন।

—মা ? কথাটা যেন অবনীশ বিস্মিত আস্বস্তিতে উচ্চারণ করলে। ঢোঁক গিলে বল্‌লে,—বিয়ে করো নি ?

হিমানীর ভুরু দু'টি কৌতুকে কুটিল হ'য়ে উঠলো: তোমার কী মনে হয় ?

অবনীশ সমস্ত শরীরে যেন শিথিল হ'য়ে এলো। বল্‌লে,—কেন করলে না ?

—কী জানি, সময় হ'লো না। হিমানীর ভুরু দু'টি আচ্ছন্ন চোখের উপর স্থির হ'য়ে রইলো: সময় হ'লো না নয়, সময়,

এলো না। বলতে পারি এমন কোনো কারণ দেখছি না। লোকে বিয়ে কেন করে? তুমি কেন করলে? কারণ আছে কিছু?

—আমি বিয়ে করেছি তোমাকে কে বললে? মিথ্যে কথা। মানুষে কতো কথাই যে রটায়। অবনীশ হঠাৎ অস্থির হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো: না আমি এবার যাই। আমার ভীষণ কাজ।

—না, না, বোসো। হিমানী উঠলো না, শুধু তার চোখের কালো কাতরতা দিয়ে তাকে ঘিরে ধরলো: এই তো বলছিলে তোমার কোনো কাজ নেই। কাজ তো আমারো কতো আছে। পৃথিবীতে তার শেষ কোথায়?

অবনীশ আবার চেয়ারের মাঝে ডুবে গেলো।

—কাজ তোমার ভীষণ হ'তে পারে, কিন্তু আমি তো আর ভীষণ নই। হিমানী হাসলো: আমাকে দেখে তো আজ আর তোমার ভয় পাবার নেই। আমি সেই হিমানী। বোসো না একটু চুপ করে'। তোমার সেই তড়বড়ে ভাব এখনো গেলো না। সেই এসেই 'যাই' 'যাই' বলে' অস্থির হ'য়ে উঠতে!

দু'জনকে আমজ্জিত করে' বইতে লাগলো স্তব্ধতার স্রোত।

অবনীশ বল্‌লে,—এক গ্লাস জল দিতে পারো? বেশ ঠাণ্ডা জল?

—খাবে? হিমানী উঠে দাঁড়ালো। কাচের গ্লাসে করে' নিয়ে এলো জল গড়িয়ে—তার আঙুলগুলির মতোই ঠাণ্ডা, পাৎলা জল। তার বাঁকাচোরা ভাঙা-ভাঙা রেখাগুলি ঘরময়

ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কাছে এসে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লে,—নাও।

জলটা অবনীশ ঠোঁটে ঠেকিয়ে খেলো কি না-খেলো।

—কই খেলে না?

—এই খাচ্ছি আস্তে-আস্তে। অবনীশ গ্লাসটা সামনের টেবিলের উপর রাখলে: সময় তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

হিমানী বসলো গিয়ে তার চেয়ারে। হাসিমুখে বল্‌লে,—তখনো তুমি এমনি এসে জল চাইতে মনে আছে? অথচ তোমাকে যখন ডাকলাম, মনে হয়েছিলো আমাকে বুঝি চিনতেই পারবে না। ও রকম করে' রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?

—কী রকম করে'?

—যেন কাউকে খুঁজছ, কোথায় যেন যাবে—

—দেখতেই পাচ্ছ কা'কে খুঁজছিলাম, কোথায় যাবো। অবনীশ ম্লান একটু হাসলে।

হিমানী খানিকক্ষণ চুপ করে' রইলো। পরে অসহায়ের মতো বলে' ফেললে: সত্যি বিয়ে করো নি?

প্রশ্নটা যেন মুহূর্ত্তের বৃন্তে দুলছে।

—পাগল। বিয়ে না করে' উপায় কী? অবনীশ আবার আকস্মিক ক্ষিপ্রতায় উঠে বসলো: আমাদের বাঁচতে হ'বে তো।

—আমিও তাই ভাবছিলাম। হিমানী খিলখিল করে' হেসে উঠলো: মানুষ কতো কথাই যে রটায়।

—কেন, কী বলে তারা? অবনীশ সত্যি-সত্যি উঠে দাঁড়ালো।

—বলে, একেবারেই নাকি বিয়ে করো নি। ও কি, আবার উঠে পড়লে কেন? বাবাঃ, একটুখানি বসলে যেন বাড়ি থেকে তোমার বউ চুরি হ'য়ে যেতো। আর যেন কেউ বিয়ে করে না। বোসো, একটু চা খেয়ে যাও।

—না, দেরি হ'য়ে যাবে। অবনীশ দ্বিধায় দুলতে লাগলো।

—হোক্‌ই বা না একটু দেরি। সময় তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

অবনীশ আবার বসলো।

হিমানী বললে,—বাড়ি তোমার এখান থেকে কদ্দূর?

—কাছেই।

—তোমার বউকে একবার বেড়াতে নিয়ে এসো না। একবার দেখতাম কতো সুন্দর। কখনো দেখি নি।

—কী দেখ নি?

—তোমার বউ। কেমন মানায় তোমার পাশে। ভারি মজা লাগছে ভাবতে তুমি কিনা বিয়ে করেছ। হিমানী হেসে উঠলো: কতো টাকা পেয়েছিলে?

—হাজার কয়েক।

—ব্যাঙ্কে বেড়ে কতো হ'লো এতোদিনে?

—পর্ব্বতাকার। তোমাকে কে বলেছে এতো সব মিথ্যে কথা?

অবনীশ হাসবার চেষ্টা করলো : একটা রসিকতা করলাম, আর অমনি তুমি বিশ্বাস করে' বসলে। সেই রকমই আছো দেখছি। কই, আমার চা কই ?

হিমানী উঠবার সময় সারা শরীরে কথার অস্ফুট মর্ম্মর তুলে বল্‌লে,—সময় আছে তো বসবার ?

—আছে। তুমি তৈরি করে' নিয়ে এসো। আমি বসছি। অবনীশ গ্লাসটা তুলে আরেক চুমুক জল খেলো।

হিমানী পাশের রান্নাঘর থেকে চা তৈরি করে' নিয়ে এলো। কয়েক মিনিট হয়তো কেটেছে। দেখলো সেই চেয়ারের হাতলের উপর আনমিত বাহুর মধ্যে মুখ ঢেকে অবনীশ ঘুমিয়ে পড়েছে। শরীরময় বিসর্পিত একটা শান্তি, একটা স্তূপীকৃত সমর্পণ। সমস্তটি স্তব্ধতা তার এই ঘুমে আর্দ্র, অবসন্ন হ'য়ে আছে। ঘুমের এই অসহায়তার মধ্যে হিমানী যেন নিজের শূন্যতা দেখতে পেলো। দেখতে পেলো তার নিজের শূন্যতার চেয়েও ভয়ঙ্কর এই ঘুম।

হিমানী চায়ের বাটিটা টেবিলের উপর নামিয়ে বিবন্ন গলায় বললে,—তোমার চা।

—চা ? ধড়মড় করে' অবনীশ উঠে বসলো, এমন চোখে তাকালো যেন কতো জন্ম সে ঘুমোতে পারেনি। শূন্য চোখে দেয়ালের চারদিকে চেয়ে সে অস্ফুট একটা চীৎকার করে' উঠলো : এ আমি কোথায় বসে' আছি ? এ কী আশ্চর্য্য কথা! কী ভীষণ!

—কেন, কী হয়েছে? হিমানী ভয় পেয়ে তার একটা হাত চেপে ধরলো।

—কী হয়েছে! ছাড়ো, ছাড়ো। অবনীশ উদ্‌ভ্রান্তের মতো বল্‌লে,—আমার স্ত্রীর মরণাপন্ন অবস্থা, আর আমি কিনা এখনো এখানে বসে' আছি! কতোক্ষণ বসে' আছি বলতে পারো?

—বলো কী? ভয় পেয়ে হিমানী তার হাত ছেড়ে দিলো: কী হয়েছে তার?

—কী না হয়েছে? অবনীশ দরজার দিকে এগিয়ে এলো: আজ দু' বছর ধরে' সে শয্যাশায়ী, আজ দু' বছর ধরে' আমার ঘুম নেই। আজ হঠাৎ তার অবস্থা স্পষ্ট খারাপের দিকে চলে' এসেছে—একেবারে শেষ অবস্থা। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে' গেছে, ছেলেমেয়েগুলির সে কান্না! আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কী আশ্চর্য্য, ডাক্তার ডাকতে না গিয়ে এখানে কী করে' এলাম?

অবনীশ দরজাটা খুলে ফেললো।

হিমানী পিছন থেকে ভীত গলায় চীৎকার করে' উঠলো: যাও, যাও, শিগ্‌গির যাও। এতোক্ষণ আমাকে বলো নি এ-কথা? হিমানীর চোখে যেন জল দাঁড়িয়ে গেছে: দাঁড়িয়ে আছো কী হাঁ করে'? কী আশ্চর্য্য, যাও। ও কি, কী ভীষণ নিষ্ঠুর তুমি! তোমার কাছে কি কোনো ভালোবাসারই দাম নেই?

অবনীশ দেখলো দিনের আকাশ ততোক্ষণে হিমানীর

চোখের পল্লবের মতো নম্র হ'য়ে এসেছে। সমস্ত সহরের চোখে নির্লিপ্ত, নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্য। রাস্তার উপরে বাড়িগুলির দীর্ঘ, অলস ছায়া পড়েছে। সমস্ত চলমান জগৎ যেন এক দিক থেকে দেখলে কেমন স্থির, একাকী, অবাস্তব।

অবনীশ আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এলো, সেই পরিচ্ছন্ন নিভৃতির উষ্ণতায়। সেই অপরিচয়ের ধূসর, কোমল আচ্ছাদনে।

হিমানী ধম্‌কে উঠলো : এ কী, গেলে না ?

—যাবোই তো। অবনীশ চেয়ারের মধ্যে শ্রান্তিতে ভেঙে পড়লো : যেতে তো হ'বেই। বোসো। ব্যস্ত কী, সময় তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না। তোমার চা-টা খেয়ে যাই।

উপন্যাস

কথার পিঠে কথা। তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, ঋজু। কখনো দ্রুত, কখনো বা স্তব্ধতায় তার উচ্চারণ। আগাগোড়া প্রখর, নিরাবরণ স্পষ্টতা। আবহাওয়াটি এতো জীবন্ত যেন স্পর্শ করা যায়।

হিরণ্ময় নতুন নাটক লিখছে।

এর আগে সে উপন্যাসে হাত মক্স করেছে বহু, কিন্তু পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কথার সার সাজিয়েও সে যেন গুছিয়ে ঠিক কথাটি বলতে পারে নি। উপন্যাসে কেবল কথার জনতা, টুকরো-টুকরো শব্দ ঢেউয়ের মতো রেখার পর রেখা মেলে অদৃশ্য হ'তে থাকে; নাটকের কথা তীরের মতো সোজা, রিভল্‌ভারের গুলির মতো নির্ভুল,—যেখানে এসে তা বেঁধে, সেখান থেকে আর তাকে উপড়ে নেয়া চলে না। উপন্যাসে বহু কথা অবান্তর, নাটকে প্রত্যেকটি কথা অবশ্যম্ভাবী। উপন্যাসে অমিতব্যয়িতা; নাটকে সংযম, কঠোরতা, কার্পণ্য। ভিড়ের সঙ্গে বাহিনীর তফাৎ নাটক হচ্ছে সুসম্বদ্ধ অর্গ্যানিজ্‌ম্‌,—যন্ত্রের মতো প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, পারস্পরিক বশ্যতা। উপন্যাসে বিস্তার, নাটকে ঘনতা। উপন্যাসে চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হয় বর্ণনায়; নাটকে হয় কথোপকথনে, প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায়। উপন্যাসে আগে বিশেষণ, পরে বিশেষ্য; নাটকে বিশেষ্য হচ্ছে আগে, তাই তার চরিত্ররা

স্পষ্ট, সীমাবদ্ধ এবং কাজে-কাজেই প্রাণবন্ত। নাটকে রচয়িতার অনধিকার প্রবেশ নেই, তার আত্মবৃত্তিতে তা আবিল হ'তে পারে না। উপন্যাসের হচ্ছে জীবন নিয়ে, নাটকের কারবার তার চেয়েও মারাত্মক—জীবিতকে নিয়ে। উপন্যাসের পাঠক তাই জীবনের চেয়ে অনেক দূরে,—যতো দূরে যেতে পারে, পাঠকের কাছে ততোই তা সুন্দর হ'য়ে ওঠে। নাটকের দর্শক জীবিতের একেবারে মুখোমুখি বসে',—যতো সামনে আসতে পারে, দর্শকের কাছে ততোই তা সত্য হ'য়ে ওঠে। নাটক-রচনায় গ্রন্থকার নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত,—এঞ্জিনের অংশগুলি ঠিক-ঠিক সন্নিবেশিত করে' তাদের সক্রিয় ও স্পন্দমান করে' তোলবার একটা যান্ত্রিক আনন্দ সে লাভ করে।

নতুন নাটক লেখবার আনন্দে হিরণ্ময় মত্ত হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু বাঙলা-থিয়েটারয়ালাদের কাছে বই চালানো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার—তার তুলনায় নাঙ্গা-পর্ব্বত আরোহণ করা অনেক সহজ। 'কোটেরি' ও 'ক্লিক্' পেরিয়ে যদি বা কখনো গ্রীন্‌রুমে ঢোকা যায়, ষ্টেজ পর্য্যন্ত আর পৌঁছোনো যায় না। বাঙালি দর্শকরা নেপথ্য থেকে এরি মধ্যে চীৎকার জুড়ে দিয়েছে—এ-বই চলবে না। এ নিতান্ত নাটক, নব-রসের একটা জগাখিচুড়ি নয়। কেন-না বাঙালি দর্শক একটি টাকা খরচ করে' পৃথিবীর যাবতীয় রস আস্বাদ করতে চায়—সব চেয়ে বীভৎসের প্রতিই তাদের পক্ষপাতিত্ব বেশি। ট্র্যাজেডির সঙ্গে অপেরার মিশেল হ'লে তবে তারা খুসি হয়। নায়িকার নাচ দেখতে না পেলে তারা নাটকের

রস পায় না—কথা বলতে-বলতে হঠাৎ উইংসের বাইরে হারমোনিয়মের বাজনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান গেয়ে না উঠলে নাটক কী! হাততালি তখনই দিতে হ'বে যখন শুনবে হিন্দু-মুসলমানের একতা বা দেশভক্তি নিয়ে অভিনেতার মুখে নাট্যকার তুমুল বক্তৃতা ফেঁদেছেন। মেয়েমানুষকে ধরে' নিয়ে এসে পরের দৃশ্যে তাকে যদি মা বলে' আরাধনা করা যায়, তা হ'লে তো কথাই নেই।

আসলে নাটক কিন্তু এই জনসাধারণের জন্যে—যা সে চায় তাই তাকে পরিবেশন করতে হ'বে। এখানে নাটক উপন্যাসের চেয়ে সঙ্কীর্ণ, কেননা উপন্যাসে লেখকের বিশেষ কিছুই দায়িত্ব নেই, একমাত্র পেনাল-কোডের দু'শো-বিরানব্বুই ধারাটা এড়াতে পারলেই হ'লো, কিন্তু নাটক চালিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাইনে দিতে হ'বে। অতএব যে-নাটকে প্রেক্ষাগৃহ কানায়-কানায় টলমল করে' ওঠবার সম্ভাবনা, তারই চাহিদা বেশি। এবং প্রেক্ষাগৃহে লোক আনবার কৌশল আয়ত্ত করতে গেলে বাঙলা-ভাষায় যা লিখতে হয়, কোনো সভ্য ভাষায় তাকে নাটক বলে না।

উপন্যাস যে-পাব্লিককে চিরকাল পরিহার করে' চলে, নাটক হচ্ছে তাদেরই জিনিস।

কিন্তু জনসাধারণকে সনাতন কাল থেকে এখনো পর্য্যন্ত আর কতো প্রশ্রয় দেয়া চলবে? নাটক যদি লোকশিক্ষারই একটা অঙ্গ বলে' বিবেচিত হয়, তবে তা তাদের রুচিগঠনেও বা সাহায্য করবে না কেন?

হিরণ্ময় লিখলে ট্র্যাজেডি—মাত্র তিনটি অঙ্কে সমাপ্ত, সহজ ঘরোয়া জীবনের একটি টুকরো, আয়ুষ্কাল দশ বৎসরেরো কম। পরিচ্ছন্ন, পরিমিত কয়টি দৃশ্য, ক্রমবর্দ্ধমান সঙ্ঘর্ষের শেষে একটি পরিপূর্ণ প্রশান্তি।

থিয়েটারের ম্যানেজার বল্‌লেন,—বইটা আমাদের অপছন্দ হয় নি, তবে একটাও গান নেই কেন ?

হিরণ্ময় হেসে বল্‌লে,—সাধারণ জীবনে আমরা কথায়-কথায় গান গেয়ে উঠি নাকি ? আর গাইলেও আমাদের হ'য়ে অন্য কেউ আড়ালে বসে' কখনো হারমোনিয়াম বাজায় ?

ম্যানেজার বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন,—লোকে যখন তাই নিচ্ছে, তখন আপনি একলা আপত্তি করলে চলবে কেন ? বেশ তো, হারমোনিয়াম ভেতরে আনা যায় তেমন কয়েকটা দৃশ্য সাজান না। আর তাই যদি বা সম্ভব না হয়, তবে গোটা-দুত্তিন দৃশ্যে একটা গাইয়ে ভিখিরিকে ঢুকিয়ে দিলেই চলে' যাবে।

ম্যানেজারের এক পার্শ্বচর টিপ্পনি কাটলো : দু'-একটা নাচ না থাকলে লোকে encore করবে কা'কে ?

হিরণ্ময়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। ফ্যাকাসে গলায় বল্‌লে,—পরিবারের বউরা ঘোমটা ফেলে দিয়ে নাচে কী করে' বলুন ?

পার্শ্বচর ঠাট্টার সুরে বল্‌লে,—কেন, নাচ তো আজকালকার শিক্ষার সংজ্ঞায় একটা আর্ট। মেয়ে দেখতে গিয়ে অনেকে নাচ দেখে পছন্দ করে' আসে। তেমনি কয়েকটা ওরিয়েণ্টাল

নাচ কোনো কায়দা করে' ঢুকিয়ে দিন্ না। সিনারি নেই, আলোর কারসাজি নেই, নাচ নেই, গান নেই—কতোগুলো কথা শোনবার জন্যে পয়সা খরচ করতে লোকের ভারি দায় পড়েছে! কোনো দৃশ্যে সামান্য একটা পিস্তল ছোঁড়বার শব্দ পর্য্যন্ত নেই।

অসহায়, বিবর্ণ দৃষ্টিতে হিরণ্ময় ম্যানেজারের দিকে তাকালো। সত্যিকারের নাটকে আর মেলোড্রামায় কী তফাৎ, নাটকের ক্রিয়া বলতে কী বোঝায়, এই সব গোড়ার কথা নিয়ে তর্ক করতে হ'বে জানলে হিরণ্ময় এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তো না, কিন্তু ম্যানেজারের গলার স্বরটা নরমই আছে ঠাহর করে' সে কতকটা আশ্বস্ত হ'লো।

ম্যানজার বল্‌লে,—যাক, ওতে বিশেষ কিছু বাধবে না। ঘটনাটা বেশ জমাটি, শেষ পর্য্যন্ত লোকের কৌতূহল থাকবে। কথোপকথনগুলি বেশ স্মার্ট ও জায়গায়-জায়গায় বেশ গভীর। আর সত্য কথা বলতে কি, কথোপকথনই হচ্ছে নাটকের আসল ক্রিয়া। তা ছাড়া 'সরযূ' যা হয়েছে—ও একটা creation। সে-জন্যে আমি আপনাকে প্রশংসাই করছি, হিরণ্ময়বাবু। আমি এ বই চালাবো, দেখি না, দুয়েকখানা আধুনিক ধাঁচের বই নিয়ে কী দাঁড়ায়। কিন্তু—

চলতে-চলতে হিরণ্ময় যেন হঠাৎ হোঁচট খেলো।

—কিন্তু, গান আপনাকে খান চারেক ঢোকাতেই হ'বে। ডিস্‌পেপ্‌টিক দেশে খাঁটি দুধ চলে না, মশাই, জল না মেশালে লোকে হজম করতে পারবে কেন? দৃশ্যে খাপ খাওয়াতে না

পারেন, অন্তত একটা অবাস্তর ক্যারেক্টার সৃষ্টি করে' নিতে হ'বে—হয় ভিক্ষুক, নয় পাগলিনী। মাঝে-মাঝে ষ্টেজে ঢুকে গান গেয়ে যাবে।

হিরণ্ময় কঠিন গলায় বল্‌লে,—সে যে নিদারুণ ট্রেস্‌পাস, মশাই। নাটকের শুচিতা থাকবে না।

ম্যানেজারো নাছোড়বান্দা, পাণ্ডুলিপিটা হিরণ্ময়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন,—তা হ'লে, আমি অত্যন্ত দুঃখিত হিরণ্ময়বাবু,—তা হ'লে এ আমি নিতে পারবো না। আমি নতুন লেখক নিয়ে একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করে' দেখব ভেবেছিলাম, কিন্তু আপনি যদি এমনি অন্যায় গোঁ ধরে' বসেন, তবে আর উপায় কী বলুন। গোটা চার-পাঁচ তো গান—আমাদের রমেন রায় অনায়াসে লিখে দিতে পারবে। এতে যদি আপনি আপত্তি করেন, তবে স্পষ্ট করে' বলে' রাখা ভালো, শুধু-শুধু এতো বড়ো risk নিতে আমাদের কারুর মাথা-ব্যথা নেই।

হিরণ্ময়ের মুখ শুকিয়ে গেল। পাণ্ডুলিপিটা সে হাতে করে' নিলে বটে, কিন্তু ভঙ্গিটাতে একটুও তেজ নেই—সে যে কিছু অপমান বোধ করছে তাও বিশেষ বোঝা গেল না। উপন্যাস হ'লে এ-অপমান সে দস্তুরমতো গায়ে মাখত, পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে সে আর এক মুহূর্ত্ত এখানে দাঁড়াত না। উপন্যাস কেউ না নিলে সময়মতো নিজে ছাপবার স্পর্দ্ধা করা যায়, কিন্তু নাটকের বেলায় সে-স্পর্দ্ধা খাটে না। 'ষ্টেজ্‌ড্‌' না হওয়া পর্য্যন্ত তার কোনো দাম নেই—তার দাম বইয়ের পৃষ্ঠায় নয়, রঙ্গমঞ্চে। অতএব

নিতান্ত অসহায় মুখভঙ্গি করে' হিরণ্ময় গান ঢোকাতে রাজি হ'লো।

কিন্তু রমেন রায়কে দিয়ে নয়, তা হ'লে সে-গান হ'বে নিতান্ত নাটুকে, নিতান্ত 'সখীর গান'। হিরণ্ময় নিজেই লিখবে যা-হোক! তাতে ম্যানেজারের আপত্তি নেই। কিন্তু গানগুলি যেন খুব বেশি সারগর্ভ না হয়, সেদিকে যেন দৃষ্টি থাকে। হিরণ্ময় আরেক সমস্যায় পড়লো। অক্ষর গুনে লাইন মেলানোই প্রাণান্তকর, তারপর ভাঙা লাইনকে সুর দিয়ে সম্পূর্ণ করা—ততক্ষণে আর একখানা ফুল-ড্রেস নাটক লেখা হ'তো। গানের জন্যে আবার অনুকূল শব্দ চাই—ঠিক শব্দ না পেলে সুর আবার ঠিক খেলে না। সমার্থসূচক এতো ভিন্ন-ভিন্ন অক্ষরসমষ্টির শব্দ পাওয়াও কঠিন। হিরণ্ময় হাল ছেড়ে দিলে।

রমেন রায়ই অবিশ্যি তারপর গান লিখে সুর যোজনা করলে। সেই গান শুনে হিরণ্ময় তার মা'র মৃত্যুর পর এই দ্বিতীয়বার চোখের জল ফেললো। কিন্তু মৃত্যুর মতো এই গানও নিষ্ঠুর, অপরিবর্ত্তনীয়—তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ খাটে না, তাকে শিরোধার্য্য করা ছাড়া আর উপায় নেই। ঠিক যখন প্রেমিক-প্রেমিকা সান্নিধ্যে অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠেছে, অমনি পিছন-দিকের দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে অভিভাবকের আবির্ভাব হ'লো! পরকীয়া প্রেমের অসীম মাধুর্য্যের মাঝে ওয়ারেণ্ট-হাতে পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর! সব মাটি। গান ঢুকিয়ে সমস্ত নাটকের সুর গেল টুকরো-টুকরো হ'য়ে।

তবু, এ-ছাড়া আর উপায় কী বলো! ম্যানেজার যে তবু

'ডায়ালোগ' বদলাতে বলেন নি, পাত্রগুলিকে বিজাতীয় রকম সতী বা অমানুষ করে' গড়বার বায়না ধরেন নি, তাতেই হিরণ্ময় যথেষ্ট আপ্যায়িত বোধ করছে। সরযূ ঠিক তেমনিই আছে, ভাগ্যিস গানগুলির একটাও তাকে গাইতে হ'বে না। হিরণ্ময় তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললে। সরযূর উপর এই নাটকীয় ধর্ষণ সে সইতে পারতো না। ম্যানেজারের সে সূক্ষ্ম রসবোধ আছে। কিন্তু ঘাড় বেঁকিয়ে গোঁ একটা ধরে' বসলে হিরণ্ময় কী করতে পারতো? না, সে দিক দিয়ে সে বেঁচে গেছে। কয়েকটা তো মাত্র অবান্তর, অসংলগ্ন গান। একটা গাজনের, একটা অন্ধ ভিক্ষুকের, আর গোটা দুই এক কীর্তনওয়ালির। নাটকের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও সমালোচনায় এদের অনায়াসে অস্বীকার করা যাবে, যেমন জীবনের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েও নাটকে অনেক জিনিস স্থান পায় না।

দেখতে-দেখতে সহরময় দেয়ালে-দেয়ালে তিন-রঙা পোষ্টার পড়লো: আধুনিক নাট্যকার হিরণ্ময় সেন-এর 'সরযূ'—পূজার আগেই মহাসমারোহে অভিনীত হ'বে। এ-বেলার পোষ্টার ও-বেলায় ঢাকা পড়ে' যায়, কিন্তু 'সরযূ'র পোষ্টার এতো প্রকাণ্ড যে সাত দিনেও তাকে নিশ্চিহ্ন করা গেল না। পূর্ণগ্রাস হ'বার আগেই দেয়ালে-দেয়ালে আবার আরেক পশলা পোষ্টারের বৃষ্টি হ'য়ে গেল—এবারে তার নবতর সজ্জা, অক্ষর তো নয়, অগ্নিমুখ বাণবর্ষণ। যে দেখে তারই চোখ দেয়ালের উপর থমকে থাকে। বাসে-ট্র্যামে জানলা ঘেঁসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসবার কারুই জো নেই

—বাঙলা দেশে অভিনব কিছু একটা শিগ্‌গির ঘটছে এ সংবাদ তার চোখে এসে পৌঁছুবেই। দৈনিক-সাপ্তাহিকগুলি এ-খবরে মর্ম্মরিত হ'য়ে উঠলো, পাব্‌লিশার মহলে প্রতিযোগিতার সাড়া পড়ে' গেল। থিয়েটারের মাথায় ইলেক্‌ট্রিক্‌ আলোর সাইন্‌ উঠলো: সরযূ। বিকীর্ণ ধূলিজালের মতো হ্যাণ্ডবিল্‌ উড়তে লাগলো: হিরণ্ময় সেন। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে, অতি-আধুনিকের প্রথম প্রত্যক্ষ অবতারণার ঔজ্জ্বল্যে, স্বর্গে-মর্ত্ত্যে আর এতটুকু শান্তি রইলো না। প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটারগুলি পেছনে পড়ে' একেবারে চুপ, মুমূর্ষু। সেখানে কি না আজো চলছে 'ঘটোৎকচ বধ'।

যেদিন রঙ্গমঞ্চে এ-নাটকের প্রথম যবনিকা উঠবে সেই দিন (তারিখ এখনো ঘোষণা করা হয় নি) বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে রেড্‌-লেটার ডে, সেই দিন থেকে সাত্যিকারের নাটকের জন্ম। খ্যাতি বা অর্থের দিক থেকে নয়, বাংলা ভাষা ও বাঙালি জীবনের এই নতুন সম্ভাবনা প্রথম সে উদ্ঘাটিত করে' দেখাতে পারবে ভেবে হিরণ্ময় রাত্রি-দিন রোমাঞ্চিত হ'তে লাগলো। এরি মধ্যে সে সহরের 'এলিট্'-মহলে পরিচিত হয়েছে, প্রকাশকেরা তার দরজায় ধন্না দিতে ব্যস্ত। সহরের কোন অঞ্চলে যে তার নামটা প্রাচীরপত্রে ঘোষিত হয় নি, সেটা প্রায় প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার জিনিস হ'য়ে উঠেছে। হিরণ্ময় যেখানে যায়, বেহালা থেকে বরানগর, ধাপা থেকে বেতাইতলা—সর্ব্বত্র তার বিজ্ঞাপন! উপন্যাস লিখলে কে তাকে চিনত, মাসিক-পত্রিকার গোড়ার দিকের পৃষ্ঠার এক কোণে তার নামটা মাত্র স্থান স্মল-পাইকা-য়্যান্টিকে শোভা পাচ্ছে। কী

সঙ্কীর্ণ স্থান—পাঠকের নিভৃত কোঠায় একান্ত একাকী মুহূর্ত্তে তার নীরব, কুণ্ঠিত উপস্থিতি—কল্পনার আকারে তার অবির্ভাব বলে' কতো অস্পষ্ট, কতো দূরস্থিত ; কিন্তু পাদপ্রদীপের আলোয় বিপুল জনতার সম্মুখে তার উপস্থিতি কতো উজ্জ্বল, কতো প্রত্যক্ষ—জীবনের আকারে আবির্ভাব বলে' কতো সে এখানে সম্পূর্ণ ও সজীব, কতো অন্তরঙ্গ। জীবনের সঙ্গে নাটকের তুলনা না খাটলেও বিধাতার সঙ্গে নাট্যকারের সাদৃশ্য আছে। নাটকীয় চরিত্রগুলি তার হাতের ক্রীড়নক, তাদের প্রস্থান-প্রবেশের টাইম-টেবিল সে-ই তৈরি করে। যেখানে তাদের চুপ করে' দেয়া হয়েছে সেখানে তারা চুপ করে'ই থাকবে ; যতোটুকু তাদের বলবার কথা, তার একচুল ব্যতিক্রম করবার উপায় নেই। তাদের কাছে হিরণ্ময় নিয়তির মতো অমোঘ, সৃষ্টির এই নির্দ্দয়তার আনন্দই তাকে অসামান্য গৌরব দিয়েছে। রাত্রে তার ঘুমের কুজ্ঝটিকায় সেই সব চরিত্ররা পা টিপে-টিপে ঘুরে বেড়ায়, কথা কয়ে' ওঠে, তাদের দীর্ঘশ্বাসে ঘরের হাওয়া ভারাক্রান্ত হ'য়ে আসে। তারা তারপর একদিন উৎসুক জনতার সামনে রেখায় ও গতিতে মূর্ত্তি গ্রহণ করবে।

একদিন যারা শুধু তার ভাবলোকে বিচরণ করতো, তারা মূর্ত্তি গ্রহণ করবে—মাত্র কৃত্রিম অক্ষরসন্নিবেশে নয়, তাদের প্রকাশ আর লোকাতীত নয়—একান্ত প্রত্যক্ষ ও সীমাবদ্ধ, বাস্তব ও যথার্থ, স্থূল ও শারীর—তারা মূর্ত্তি গ্রহণ করবে পরিপূর্ণ জীবনের অনুপাতে। স্পষ্ট রঙ্গমঞ্চের উপর। একেবারে চোখের সামনে।

চরিত্রগুলির এই অসহনীয় প্রাণবত্তাই হচ্ছে হিরণ্ময়ের প্রধান গর্ব্ব।

. রিহার্সেল সুরু হ'য়ে গেছে। ম্যানেজার হিরণ্ময়কে নিমন্ত্রণ করে' পাঠালেন।

থিয়েটারে যাবার জন্যেই দুপুর বেলা হিরণ্ময় সাজগোজ করছিলো, হঠাৎ সাইক্ল-পিওন তার নামের একটা টেলিগ্রাম এনে হাজির। একেই বলে নাটকীয় পটপরিবর্ত্তন। তার বাবার অসুখ অত্যন্ত বেড়েছে—তাকে কাছাকাছি ট্রেনে যতো সম্ভব তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হ'বে। বাবার অবস্থার কথা শুনে মন বিমর্ষ হ'য়ে উঠলেও টেলিগ্রামখানার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের নাটকীয়তায় হিরণ্ময় মনে-মনে না হেসে পারলে না। এবং সে-রাত্রেই সে ট্রেন নিলে।

সারা রাস্তা তার দুঃসহ উদ্বেগে কাটলো। বাবার কথা ভেবে ততো নয়, তার নাটকের সরযূর কথা ভেবে। বস্তুত, নাটক অর্থ তো ভঙ্গিবহুল অনর্গল আবৃত্তি নয়, জীবনের প্রতিরূপতার অর্থময় অভিব্যক্তি। কবিতায় ভাষাতীত সঙ্কেতের মতো নাটকের হচ্ছে স্পষ্ট, জীবন্ত অভিনয়। সত্যের সুন্দর ও সহজ একটি ভাণ। এই ভাণই হচ্ছে শিল্পচাতুর্য্যের মর্ম্মমূল। তার সরযূকে যে-অভিনেত্রী ভাণে-ভঙ্গিতে স্পষ্ট মূর্ত্তি দেবার স্পর্দ্ধা করছে, তার ক্ষমতা সম্বন্ধে হিরণ্ময় ক্রমে-ক্রমে সন্দিহান হ'য়ে উঠলো। কেমন তার চেহারা, কেমন তার ধ্বনি, কেমন না-জানি তার ছন্দ! আর-আর চরিত্রের জন্যে ততো সে ভাবে না, কিন্তু

সরযূর প্রতি তার অসীম মায়া! কতো করে' সে তাকে সৃষ্টি করেছে—অন্তত তার সম্বন্ধে সে বিধাতার মতো স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারে নি। সে তার কল্পনোত্তমা, বিধাতার কাছে যেমন ঈভ! যার রূপে ও কণ্ঠস্বরে সে প্রকাশিত হ'বে, উচ্চারিত হ'বে, মনে-মনে তার একটা খসড়া ছবি এঁকে হিরণ্ময় দস্তুরমতো মিইয়ে গেল। বাঙলা-ষ্টেজের অভিনেত্রীদের গুণপনা জানতে তো তার বাকি নেই। তাদের মধ্যে কে আছে তার সরযূর উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারে? নিষ্কম্প দীপশিখার মতো ঋজু ও দীর্ঘ আকৃতি এদের আছে কা'র? দুই বিশাল চক্ষুময় দীপ্তিতে দুঃখের অবিচলিত কাঠিন্য ও প্রেমের সুগভীর স্তব্ধতা কে ফুটিয়ে তুলতে পারবে? ভাণ, নিদারুণ ভাণই বটে! স্থূলোদরী, পান-দোক্তা খেয়ে-খেয়ে দাঁত তেঁতুল-বিচির মতো কালো, উচ্চারণে কোথাও এতোটুকু কৃষ্টির পরিচয় নেই, ভঙ্গিতে গণিকা-সুলভ অপরিচ্ছন্নতা—এদেরই মাইনে-করা কেউ সরযূর পার্টে নামবে ভাবতে হিরণ্ময় অস্থির হ'য়ে উঠলো। তার সেই সরযূ—জীবনের অভিসারে বেরিয়ে ঘটনাচক্রে যে একটা আবিল আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়ে' সেই অবস্থার সঙ্গে প্রাণপণে সংগ্রাম করছে—তারই এই নাটকীয় পরিণাম! কোথায় আর তার সেই তেজ, সেই নিষ্ঠুরতা, সেই সৌন্দর্য্য! নাটক তো শুধু দৃশ্য-পরম্পরার অবিকল বিবৃতি নয়, জীবনের উদ্ঘাটন; তাই অভিনয়ের বেলায় চরিত্রানুগত আকৃতির অভাবটাই হচ্ছে নিদারুণ অশ্লীলতা! কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় কী বলো? বাঙলা-ষ্টেজের অভিনেত্রীরা মাত্র অভিনেত্রী নয়, অভিনয়ের শেষে

তাদের অতিরিক্ত অভিনয় করতে হয়। শরীরের প্রতি স্নেহ নেই, জীবনধারণে সামান্যতম মর্য্যাদাবোধ নেই। সারা জীবন তারা অভিনয়ই করে' চলেছে। কিন্তু সরযূর বেলায় আর-কাউকে পাওয়া যেতো—যে অভিনয়ের শেষে আবার অভিনয় করতে বসতো না! কথাটা মনে করে' হিরণ্ময় ট্রেনের মধ্যেই হেসে উঠলো। তবু রিহার্সেলের সময় উপস্থিত থাকতে পারলে অনেক সুবিধে হ'তো বৈ কি। স্বরূপ বা চেহারা বদলাতে না পারলেও দু'-একটা ভাব-ভঙ্গি বাৎলে দিতে পারতো, উপদেশগুলি যাতে প্রতিপালিত হয় তাতে স্বয়ং নাট্যকারের ব্যক্তিত্ব জাহির করতে ছাড়তো না। অন্তত, আর যাই হোক, সরযূর সম্বন্ধে প্রস্তুত হ'তে পারতো আগে থেকে।

অত সব আবদারে কাজ নেই! নাটকটা যে নিয়েছে, এতেই তার গ্রহদেবতাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। ভিড়ের মধ্যে বহু কষ্টে ট্রেনে উঠতে পেরে এখন যে সে রীতিমতো গা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে নিতে চায়!

বাবাকে একটু ভালোর দিকে ফিরতে দেখে হিরণ্ময় যেদিন কল্‌কাতা এসে পৌছুলো সেদিন রাত সাড়ে-সাতটার সময় তার নাটকের প্রথম রজনী। ম্যানেজার তাকে জরুরি টেলিগ্রাম করেছে। হিরণ্ময় যখন তার ফ্ল্যাট-এ এসে পৌছুলো, তখন বেলা প্রায় দু'টো।

রুদ্রের আবির্ভাব

লোয়ার-সার্কুলার রোডে ফিরিঙ্গি-পাড়ায় একটা বিরাট কোর্টের দোতলার উপর একখানা ঘর নিয়ে তার ফ্ল্যাট। ঔপন্যাসিক হ'লে সে মেসে থাকতো, সঙ্কীর্ণ ফোর-সিটেড কোঠায়; কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে ঘরের একটি সম্পূর্ণতা চাই, আভ্যন্তরিক দৃশ্যের একটা নাটকীয় সম্ভাবনা থাকা প্রয়োজন। আসবাবে-বিছানায়, চেয়ারে-টেবিলে, ঘরটি তার এমন কৌশলে সাজানো যে তালা খুলে ঘরে ঢুকতেই হিরণ্ময়ের মনে হ'লো যেন নাটকের প্রথম দৃশ্যে সে এসে পড়েছে। চাকর যতোক্ষণ আলনা-আলমারি সাফ করছে, ততক্ষণে হিরণ্ময় স্নান করে' নিলে। খাবার আসতে আসতে ষ্টেশনে-থেকে-কেনা কাগজের বাণ্ডিলটা খুলে সে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে নিতে পারবে। হাওড়া ষ্টেশন থেকে সুরু করে' শেয়ালদার এই প্রান্ত পর্য্যন্ত দেয়ালে-দেয়ালে তার নাটকের নতুন পোষ্টার পড়েছে—সেই দ্বিতীয় অঙ্কের দৃশ্যটা, যেখানে সরযূ তার ঘুমন্ত স্বামীর শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে বেরুবার আগে স্বামীর দিকে ফিরে তাকিয়ে করুণ চোখে ক্ষমা প্রার্থনা করছে! চমৎকার ছবিটা, চমৎকার তার সেটিঙ্। চিত্রকর তার তুলিতে যতদূর গেছে, অভিনেত্রী তার আকারে বা ভঙ্গিতে তার এক ক্রোশের কাছাকাছিও আসতে পারবে না—তা হিরণ্ময় জানে, তবু—হিরণ্ময় ক্ষিপ্রহাতে সাপ্তাহিক-দৈনিকগুলি ঘাঁটতে বসলো। দৈনিকগুলিতে পৃষ্ঠাজোড়া বিজ্ঞাপন—রোমহর্ষক বিশেষণের ছড়াছড়ি দেখে অতিস্তুতিতে হিরণ্ময়েরই নিজের লজ্জা করতে লাগলো। সাপ্তাহিকগুলি এরি মধ্যে, না-দেখেই, বইয়ের গুণকীর্ত্তনে

ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে—এ-নাটক নাকি রচনা ও অভিনয় দু'দিক থেকেই হ'বে একটা অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়! এ-উক্তিতে হিরণ্ময়ের সায় আছে, অন্তত রচনার দিক থেকে যে এ একটা 'ট্রায়াম্ফ্'—অভিনয় না দেখে তা বলবার অধিকার অন্য-কাউকে দিতে আর আপত্তি নেই।

সন্ধ্যা হ'তে-না-হ'তেই সহরের সমস্ত মোটর আজ উত্তরমুখো; হষ্টেল-মেস আজ ট্র্যামে-বাস্এ উঠে এলো। এমন সন্ধ্যায় হিরণ্ময় কি না একেবারে একা। ফ্ল্যাট-এ থাকবার এই দোষ, সৃষ্টিকর্ত্তার দূরত্ব রাখবার এই অসুবিধে—তার জয়ে তার সঙ্গে কেউ গর্ব্ব করবার নেই। কল্কাতায় এমন তার কোনো আত্মীয়দল নেই যাদের সে একটা বক্স দেয়, এমন কোনো বন্ধু নেই যাদের পাশ দিয়ে তাদের স্বাধীন সমালোচনার মুখ বন্ধ করে' রাখে। সবাইর সঙ্গে সে-ও আজ একজন নিরীহ দর্শক মাত্র। নিতান্ত সাদাসিধে পোষাক পরে' সে-ও চলেছে উত্তরমুখো।

বক্স-অফিসে অসম্ভব ভিড়—পাঁচ টাকার কয়েকখানা টিকিট ছাড়া সব নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। কালকের ম্যাটিনিতে তিন টাকার কয়েকখানা এখনো আছে বটে। অসন্তুষ্ট হ'লেও দর্শকরা কেউ নিরাশ হ'বার পাত্র নয়—তাই, পাঁচ টাকারই দিন, মশাই। গিস্গিস্ করছে লোক, গিস্গিস্ করছে গাড়ি। হাঁক-ডাক, হৈ-চৈ, হুলুস্থুল। সোডা-লেমনেড, চা-চপ, প্রোগ্রাম। হিরণ্ময় একটা প্রোগ্রাম কিনলে। সাড়ি-ব্লাউজ, নাগরা-স্যাণ্ডেল, বেণী-ঘোমটা, গয়না-গাটি, কোলে আবার কা'দের সদ্যপ্রসূত শিশু-সন্তান। সবাইর দৃষ্টি এখানে-ওখানে ছিটিয়ে পড়ছে—হিরণ্ময় বারে-বারে চমকে উঠতে লাগলো কেউ

তাকে চিনে ফেললে কি না। যে-যার চেয়ারে গিয়ে বসছে; কারু লাল, কারু বা টিকিট হলদে, কেউ করছে টিকিট-কালেক্টারের সঙ্গে ঝগড়া। সবাইর দেখাদেখি হিরণ্ময়ও হলের সমুখ-দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো—যেখানে সব চেয়ে নিচু ক্লাসের প্রবেশ পথ। ঢেকার টিকিট চাইলে। সে-কথাটা হিরণ্ময়ের খেয়াল ছিলো না।

না, আর পাঁচ জনের সঙ্গে নিজের সে কোনো তফাৎ রাখবে না। সবাইর মতো সে-ও একজন সাধারণ দর্শক মাত্র। হিরণ্ময় তাড়াতাড়ি টিকিট-ঘরে গিয়ে একখানি পাঁচ টাকার টিকিট কিনলে; সিট্‌টা পড়লো একেবারে কোণের দিকে। প্রেক্ষাগৃহ লোকে লোকারণ্য, সামনের দু'টো লাইনে গণ্যমান্য সাহিত্যিক ও সমালোচকের ভিড়, দোতলায় মহিলাদের বিচিত্র প্রদর্শনী। সবাইর থেকে নিজেকে আড়াল করে' রেখে হিরণ্ময় কেবল যবনিকোত্তলনের প্রথম মুহূর্ত্তটির অপেক্ষা করতে লাগলো।

যেখানে সে বসেছে সহজে সেখানটায় কারুর নজর পড়ে না। কিন্তু নিরীহ ও অপক্ষপাত দর্শক হ'য়ে চুপ করে' কৌতূহলী হ'য়ে বসে' থাকাও তার পক্ষে কষ্টকর—পর্দ্দা আর উঠছে না। কোথায় যেন কী গোলমাল হচ্ছে, অভিনেতাদের কেউ হয়তো সন্ধ্যাকালে হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে, সরযূর পার্ট হয়তো তৈরি হয় নি। হিরণ্ময় ঘামতে সুরু করলে। সরযূ! কা'র হাতে পড়ে' না-জানি আজ তার অপমৃত্যু ঘটে! এবং অপক্ষপাত নিরীহ দর্শকের মতো নির্ব্বিচারে তাই তাকে মেনে নিতে হ'বে।

উপন্যাস

না, এতোক্ষণে ঘণ্টা দিয়েছে। হিরণ্ময়ের হৃৎপিণ্ডও সেই সঙ্গে ঘণ্টার মতোই বেজে উঠলো। স্ক্রিন উঠে গেলো। ঘরময় সাগ্রহ নিস্তব্ধতা।

চাপা, ফিকে-সবুজ আলোয় ধূসর গোধূলি সূচিত হচ্ছে,—বইয়ে প্রথম দৃশ্যের মঞ্চসজ্জার যে নির্দ্দেশ ছিলো তার একচুল অদলবদল হয় নি—দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটি থেকে সুরু করে' মেঝের একধারে কুঁজোর মাথায় উপুড়-করা এনামেলের গ্লাসটি পর্য্যন্ত হুবহু। পাশে রান্নাঘরের উনুনে সবে যে আগুন দেয়া হয়েছে তার স্পষ্ট আভাস। তেলওয়ালা কেরোসিন তেল দিয়ে মাথায় টিন চাপিয়ে উঠানের ধার দিয়ে চলে' যাচ্ছে। একটা তিন-নম্বর ফুটবল নিয়ে দু'টি ছেলে—গায়ে ফতুয়া ও পরনে হ্যাফপ্যাণ্ট—গোলমাল করতে-করতে ঘরের মধ্য দিয়ে চলে' গেলো। রান্নাঘরে দু'টি টুং-টাং বাসন-কোসনের শব্দ। একেবারে অবিকল। একখানা একতলা বাড়িতে একটি দরিদ্র কেরানি-জীবনের একটুকরো নিঃশব্দ ছবি।

এইবার আপিস থেকে সুরেশ ঘরে ঢুকবে—ঐ পাশের দরজা দিয়ে। সব হিরণ্ময়ের মুখস্ত। হ্যাঁ, ঠিক ঐ পাশের দরজা দিয়েই সুরেশ এলো। দরজাটা খুলতেই রাস্তার খানিকটা আভাস পাওয়া গেল—চীনেবাদামওয়ালা রোয়াকের ওপর ডালা নামিয়ে ঝালচানা বেচছে। সুরেশ গায়ের জামাটা খুলে ফেলে চেয়ারে বসলো

জুতোর ফিতে খুলতে। এইবার সরযূ আসবে। ওদিকের দরজা দিয়ে, একটু চঞ্চল পায়ে—স্বামীকে একটি নীরব প্রসন্ন হাসি উপহার দিয়ে ধীরে পায়ের তলায় বসে' জুতোয় হাত দেবে। নিতান্তই মামুলি, সহজ, পরিচিত একটি দৃশ্য। হিরণ্ময় তার সর্ব্বাঙ্গ চক্ষুষ্মান করে' সরযূর প্রথম প্রবেশ-পথের দিকে চেয়ে রইলো।

এই সরযূ! হিরণ্ময় যেমনটি চেয়েছিলো ঠিক তেমনি। চমৎকার, অপরূপ! সংসারচারিণী গৃহলক্ষ্মীর ঈষৎ অপরিচ্ছন্ন বেশবাস, পরিচর্য্যা-পরায়ণ কমনীয় হাতে দুইগাছি মাত্র শাঁখার চুড়ি, পায়ের পাতায় আল্‌তার দাগটি কবে থেকে ফিকে হ'য়ে এসেছে, একরাশ অযত্নপুঞ্জিত চুলের উপর শিথিল একটি ঘোমটা। মূর্ত্তিমতী দারিদ্র্য-শ্রী। লংক্লথের সেমিজের উপর দিশি মিলের কস্তাপাড় একখানি আটপৌরে সাড়ি। কিন্তু দাঁড়াবার ভঙ্গিতে তার আত্মবোধের প্রচ্ছন্ন একটি তেজ হিরণ্ময় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গী, কৃশতায় রুচির, দু'টি দীপ্তিপরিপূর্ণ অগাধ চক্ষু সুরেশের থেকে স্বতন্ত্র। যা হিরণ্ময় চেয়েছে। ঠিক তার ট্র্যাজেডির নায়িকা: এমন মেয়ে রঙ্গমঞ্চে এলো কী করে'?

তারপর সুরু হ'লো কথা। কথার পিঠে কথা। ঋজু, উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ। সব হিরণ্ময়ের মুখস্ত। চেহারায় যদিও-বা মেয়েটি অভিনেত্রী ছিলো, কথায় সে অবিকল সরযূ, তার মানস-উর্ব্বশী। এই সব কথা সত্যিই সে সরযূর মুখ দিয়ে বলিয়েছিলো কি না হিরণ্ময়ের এখন ক্রমে-ক্রমে সন্দেহ হচ্ছে। সেই কথার এত অর্থ ও সঙ্কেত ছিলো বলে' তার নিজেরই কোনো ধারণা ছিলো না। কথাই চরিত্রকে

সীমা দেয়, স্বকীয়তা দেয়, পরিপূর্ণ ব্যক্তি করে' তোলে। মেয়েটি 'সরযূ'র অভিনেত্রী নয়, মেয়েটি 'সরযূ'র ব্যক্তি। কেমন ধীরে-ধীরে সঙ্ঘর্ষের সূত্রপাত হচ্ছে। এ যে পরের অঙ্কে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে' সতীত্বের চেয়ে মহত্তরো মনুষ্যত্বের সন্ধানে বহির্গত হ'বে তাতে আর সন্দেহ নেই। এবং এ-মেয়ে বাঙালি মেয়ের মুখরক্ষা করতে কখনো আর স্বামীর ঘরে ফিরে আসছে না।

হিরণ্ময়ের সমস্ত চেতনায় যেন আগুন ধরে' গেল। সরযূর এমন অভিব্যক্তি সে তার কল্পনার উত্তুঙ্গতম চূড়ায় উঠে কেবল আশাই করতে, পারতো বইয়ের নিঃশব্দ পৃষ্ঠা থেকে, সেই কল্পনার উত্তুঙ্গতম চূড়া থেকে তার সরযূ বাঙলা-রঙ্গমঞ্চের আবিল আবহাওয়ায় কী করে' নেমে এলো? সেই পরিমিত ভঙ্গি, সেই কঠিন মর্যাদাবোধ, সেই ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক ব্যবহার! সব চেয়ে প্রকাণ্ড বিস্ময়, বয়সেও সে সরযূর সমান, আকারে-ইঙ্গিতে, কথায়-বার্ত্তায় সেই আভিজাত্য—অনুকরণে কোথাও এতটুকু বিকৃতি নেই। হিরণ্ময় তন্ময় হ'য়ে গেল। সে আর একজন সাধারণ দর্শক নয়, সে আর-সবাইর মতো অভিনেত্রীকে দেখছে না, সে দেখছে তার সরযূকে।

সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ, হাততালি দিয়ে একটি কথাকেও কেউ হারাতে চায় না।

প্রথম অঙ্কের কার্টেন পড়তেই ম্যানেজার প্রেক্ষাগৃহে নেমে এলেন জনতার উপর নাটকের প্রভাব নির্ণয় করতে। হিরণ্ময় আর আত্মগোপন করতে পারলো না, তাঁর সামনে এসেই উদয় হ'লো।

—এ কী? আপনি এসেছেন কখন? বা রে, চুপটি করে' ওখানে একা বসে' আছেন? সে কী, টিকিট কেটে?

হিরণ্ময় হেসে বল্‌লে,—দর্শক হ'য়েই আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সরযূকে দেখতে পেয়ে আর ভুলে থাকতে পারলাম না যে আমিই হচ্ছি ওর সৃষ্টিকর্তা।

ম্যানেজার তার হাত ধরে' টানতে-টানতে বল্‌লেন,—ছি, ছি, সে কী কাণ্ড! আসুন, ভেতরে আসুন আমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে হয়! আপনার জন্যে বক্স রেডি। আমার টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন তো? সঙ্গে আর কেউ আছে?

—না। ম্যানেজারের সঙ্গে হলটা পেরিয়ে যেতে-যেতে হিরণ্ময় বল্‌লে,—বইটা কেমন চলবে বলে' মনে হচ্ছে?

তৃপ্ত কণ্ঠে ম্যানেজার বল্‌লেন,—ভালোই। বিজ্ঞাপনে কম খরচ করিনি, মশাই। তারপর সরযূর পার্ট যা হচ্ছে, সুপার্ব। এখন কি? দেখবেন আরো পরে—লাষ্ট সিন্‌টার মতো তেমন দৃশ্য বাঙলা-নাটকে এ-পর্য্যন্ত কখনো প্লে হয় নি। দেখবেন!

ঢোঁক গিলে হিরণ্ময় বললে,—এই সরযূটি কে? কোনো ভদ্রঘরের মেয়ে নয় তো?

ম্যানেজার হেসে উঠলেন। তারপর গলা নামিয়ে বল্‌লেন,—পাগল! আমাদের বন্ধু এটর্নি ননীমাধববাবুর। তা অভিনয় করে বটে। বিশেষ করে' এই 'রোলে' যা মানিয়েছে! চলুন, পারুলের সঙ্গেই আগে আপনার সাক্ষাৎ করিয়ে দি। আরো অনেকেই নাট্যকারকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত বটে, কিন্তু পারুলও কম

ব্যর্থ নয়। বলে' ম্যানেজার তাকে ঘুর-পথে ষ্টেজের মধ্যে নিয়ে এলেন।

পারুলের জন্যে আলাদা সাজঘর,—অন্য অভিনেত্রীদের সে সমগোত্রীয় নয়। ম্যানেজার হিরণ্ময়কে নিয়ে দরজার কাছে আসতেই প্রথমে দেখা হয়ে গেল ননীমাধববাবুর সঙ্গে—একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে সিগ্রেট টানছেন। তার সঙ্গে আলাপ সাঙ্গ করে' পাস্পোর্ট নিয়ে হিরণ্ময়কে ভিতরে ঢুকতে হ'লো। পারুল ততক্ষণে তার দ্বিতীয় অঙ্কের সাজগোজ শেষ করেছে। এই বার সে প্রথমে তার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ফিরছে—তাই এখন তার পরিচ্ছদের একটু ঘটা। আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে শেষবার সে মুখে পাউডার ঘসছিলো।

ম্যানেজার ডাকলেন,—পারুল, তোমার সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দি। ইনিই হচ্ছেন আমাদের নবীন নাট্যকার—হিরণ্ময় সেন।

পারুল ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যেন কেমন লজ্জায় অভিভূত হ'য়ে পড়লো। একটা চেয়ার টেনে দিয়ে অল্প একটু হেসে শুধু বল্লে,—বসুন।

ঠিক সরযু! এতো সামনে এসেও হিরণ্ময়ের মোহভঙ্গ হ'লো না। সেই জ্যোতি যেন এরো উপস্থিতিতে সমান বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

—আপনাকে এক বাটি চা এনে দিই, কী বলুন? বলে' উত্তরের অপেক্ষা না করে' ম্যানেজার দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

পারুল বললে,—কেমন দেখছেন ?

হিরণ্ময় মুগ্ধের মতো বললে,—নাটক কেমন জানি না, কিন্তু অভিনয় চমৎকার হচ্ছে। এতো চমৎকার যে, সরযূর থেকে আপনাকে আলাদা করতে পারছি না।

বিবাহের কুমারীর মতো পারুল হঠাৎ ব্রীড়ায় আরক্তিম হ'য়ে উঠলো। কুণ্ঠিত গলায় বললে,—কিন্তু নাটকীয় বস্তু না থাকলে অভিনয় করবো কী ! যাই বলুন, কোনো পার্টে আমি এর আগে এতো 'য়্যাট হোম' 'ফিল' করিনি। আপনাকে সে জন্যে ধন্যবাদ।

হিরণ্ময় তার সস্মিত ও সুকুমার মুখের দিকে চেয়ে বললে,—আমার নায়িকা যে এমন শরীরী অভিব্যক্তি লাভ করবে তাও আমার ধারণার অতীত ছিলো। ধন্যবাদ আপনাকে আমার দেয়া উচিত।

—না, আপনি জানেন না। পারুল স্নিগ্ধ স্বরে বললে,—আমি প্রায় দশ-এগারো বছর ধরে' নায়িকার পার্টে নামছি, কিন্তু এর আগে অভিনীত চরিত্রের প্রভাব আমাকে এমন করে' কখনো অভিভূত করে নি। দেখুন না, দ্বিতীয় অঙ্কে সরযূ কেমন দাঁড়ায়। আপনিও তা কোনোদিন ভাবতে পারেন নি, হিরণ্ময়বাবু। বলতে-বলতে হঠাৎ সে থেমে পড়ে' অল্প একটু হাসলে, যেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার সামনে এতটা অহঙ্কার তার শোভা পায় না।

হিরণ্ময় দেখতে পেলে তার কথায় সেই দীপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ, মুখভাবে সেই অনির্ব্বচনীয় লাবণ্য—যে-লাবণ্য চামড়ার নয়, চরিত্রের। দীর্ঘচ্ছন্দ, কৃশ দেহ আবেগের উজ্জ্বলতায় মৃদু-মৃদু

কাঁপছে—দুই চোখ-ভরা তার সেই তীব্র সন্ধিৎসা। পারুল নয়, এটর্নি ননীমাধববাবুর কেউ নয়, এ তার কল্পনাচারিণী সরযূ, তার ট্র্যাজেডির নায়িকা।

দ্বিতীয় অঙ্কের ঘণ্টা পড়লো। হিরণ্ময় ব্যস্ত হ'য়ে উঠে যাচ্ছিলো, পারুল অপরূপ করে' হেসে বল্‌লে,—আমার এনট্র্যান্স তো আরো পরে। আরো একটু বসুন। আপনার চা আসছে।

আমতা-আমতা করে' হিরণ্ময় বল্‌লে,—সরযূর ওপর পক্ষপাত আমার বেশি বটে, কিন্তু নাটকের আর-সবাইর সংস্পর্শে না এলে সে ফুটবে কী করে'?

পারুল বল্‌লে,—রিহার্সেলে এসেই তো ওদের দেখে নিতে পারতেন।

হিরণ্ময় যাবার ভঙ্গি করে' হেসে বল্‌লে,—সেই সঙ্গে তো আপনাকেও দেখা হ'য়ে যেতো।

আবদারের সুরে পারুল বল্‌লে,—কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের পর আরেকটিবার আসবেন যেন। কেমন হয়, এ-কথা আপনি ছাড়া আর কারু মুখে শুনে আমি বিশ্বাস করবো না।

—নিশ্চয়। বলে' হিরণ্ময় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। ওখানে সরযূ আছে বটে, কিন্তু তার পারিপার্শ্বিকতাটি নিষ্প্রভ।

দ্বিতীয় অঙ্কের পর পারুলের ঘরে গিয়ে হিরণ্ময় দেখতে পেলে পারুল একটা সোফার উপর এলিয়ে পড়েছে, মুখে-চোখে অসম্ভব শ্রান্তি ও উত্তেজনা, ননীমাধববাবু ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা তার পরিচর্য্যায় অত্যন্ত ব্যস্ত। স্বামীর রোগশয্যার পাশে বসতে যাবার

সময় আরেকবার সরযূর সাড়ি বদলাতে হয়েছিলো, এইবারের সাড়িখানির ভারি মিঠে রং, বিদ্রোহের বদলে তাতে বরং ব্যর্থতার আভাস। হিরণ্ময়ের মনে হচ্ছিলো তার সরযূর অব্যবহিত অন্তর্দ্ধানের পর এমনি অসহনীয় শ্রান্তিই হয়তো তাকে আচ্ছন্ন করে' ধরেছিলো—সে-কথা নাটকের কোনো জায়গায় লেখা হয় নি। এখন সরযূর জন্যে, বিশেষ করে' তার এই শরীরিনী প্রতিমার জন্যে মমতার সে আর পার খুঁজে পাচ্ছে না।

তাকে দেখে পারুল চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। বল্‌লে,—আসুন। কেমন দেখলেন এবার?

হিরণ্ময় তার কী উত্তর দেবে? শুধু বল্‌লে,—ভারি অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন দেখছি।

ননীমাধববাবু মুরুব্বিয়ানা করে' বল্‌লেন,—যা মশাই, শক্ত পার্ট লিখেছেন! তায় আবার ওর হার্টটা দুর্ব্বল। আর এমন সিরিয়াস্‌লিই পার্টটা করছে। এবারের ইনটারভেলটা যেন বেশিক্ষণ দেয়া হয়—ও আগে সুস্থ হোক।

পারুল উঠে বসলো। বল্‌লে,—আপনাকে আমি আরো একবার ধন্যবাদ দিচ্ছি, হিরণ্ময়বাবু। এ-পার্ট শুধু শক্ত নয়, রীতিমতো বিস্ময়কর। খানিকক্ষণ এ-পার্টের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে গেলে ভেতর থেকে কখন অলক্ষ্যে পরিবর্ত্তন হ'তে থাকে। সেই উগ্র নেশার ঝাঁজে আমার স্নায়ু-শিরা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। পরে ননীমাধববাবুর দিকে চেয়ে হেসে সে বল্‌লে,—ক্লাইম্যাক্সে উঠবো আমি তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে। সরযূর সেই

মহান পতনই আমার ঐশ্বর্য্য—মরবো, তবু স্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে ক্ষমা চাইবো না। না, আমি রেডি—ইন্‌টারভেল বেশিক্ষণ দেবার দরকার নেই।

সুরু হ'লো তৃতীয় অঙ্ক। সমস্ত জনতা ঝড়ের আগেকার সমুদ্রের মতো স্থির।

যবনিকা পড়তেই ভিড় ঠেলে কৌতূহলী দর্শক-সমালোচকের সপ্রশংস দৃষ্টি এড়িয়ে (ম্যানেজারের বিজ্ঞাপনের কায়দায় ততক্ষণ তার স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে) হিরণ্ময় পারুলের ঘরের দিকে রওনা হ'লো।

ঘর শূন্য। থিয়েটার শেষ হ'তেই ননীমাধববাবু তাঁর মোটরে করে' পারুলকে বাড়ি নিয়ে গেছেন। অভিনয়ের অতিরিক্ত কোনো কাজ তার আর এখানে থাকতে পারে না।

তারপর যতদিনই তার বই বোর্ডে দিয়েছে, ততদিনই হিরণ্ময় হাজির—এবার থেকে আর দর্শকের পার্টে নয়, স্বয়ং নাট্যকারের বেশে। তাই তার স্থান আর সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে নয়, পারুলের নিভৃত কোঠায়। অভিনয়ের শেষে ও আগে দু'জনে তারা গল্প করে—ননীমাধববাবুর প্রভাব রঙ্গমঞ্চে খানিকটা শিথিল। এখানে পারুলের স্বাধীনতা বা প্রভুত্বের উপর তাঁর

তত হাত নেই। তাই তাঁকেও বিরক্তি চেপে রেখে হিরণ্ময়ের সঙ্গে সসৌজন্যে আলাপ করতে হয়।

হিরণ্ময় বলে: আপনাকে না পেলে আমার সরযূ ম্রিয়মাণ, কুষ্ঠিত হ'য়ে থাকতো।

পারুল বলে: আর আপনাকে না পেলে আমার প্রতিভাও থাকতো নিষ্প্রভ। এতোদিন বাদে এই চরিত্রটির সঙ্গে নিজের কৃত্রিম একটা সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে আমি আমার মনে জীবনের গভীর একটি স্বাদ পাচ্ছি।

কথা শুনে হিরণ্ময় মুগ্ধ হ'য়ে যায়। মনে হয় রঙ্গমঞ্চ থেকে ক্ষণকালের জন্যে বাইরে চলে' এসেও পারুল সরযূর খোলস খুলে ফেলতে পারে নি। সর্ব্বাঙ্গে তার সেই আভা এখনো ছড়িয়ে আছে। অস্তমিত চন্দ্রের লাবণ্যে আকাশের স্বচ্ছতার মতো পারুলেরো জীবনে এখন মৃত সরযূর সুন্দর পাণ্ডুরতা এসেছে। তার কথাগুলি যেন ননীমাধববাবুর কারুর কথা নয়, সেই মৃত্যু-অনুরাগিণী মহীয়সী সরযূর কথা। অন্তত তেমনি করে' কথা বলতেই তাকে সে শিখিয়ে দিয়েছে—সে, হিরণ্ময়, সরযূ যার মানস-প্রতিমা!

হিরণ্ময় একদৃষ্টে তার সুকুমার, প্রতিভামণ্ডিত মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বয়সের একটি রেখাও তার চোখে পড়ে না। সর্ব্বাঙ্গে কোথাও তার এতটুকু কলুষ নেই, জ্বালা নেই। দু'টি চোখে গভীর আত্মদর্শনপিপাসা। অন্তত এমনি করে'ই সে তার সরযূকে দেখতে চেয়েছিলো।

ডান হাতে একটা হতাশা-সূচক ভঙ্গি করে' পারুল বলে: কিন্তু কতোদিন এই অলৌকিক জীবন যাপন করবার সৌভাগ্য হয় সে সম্বন্ধে এখনই ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

উদ্বিগ্ন হ'য়ে হিরণ্ময় জিগ্‌গেস করে: কেন?

—দেখছেন না এরি মধ্যে দর্শকের সংখ্যা দিন-কে-দিন কেমন পড়ে' যাচ্ছে? এ-জিনিস কি সহজে কেউ নিতে চায়, হিরণ্ময়বাবু? আপনি যে সমাজের ভিৎ নড়িয়ে দিতে চেয়েছেন! তুচ্ছ কতোগুলি মানুষের জনতায় যে নির্জ্জীব সমাজ, তার তুলনায় একটি জীবন্ত, পূর্ণাঙ্গ মানুষ যে কতো বড়ো, এ-কথা বুঝতে গেলেই যে বিপদ! ম্যানেজার-মশাই তো এরি মধ্যে প্রায় হাল ছেড়ে দেবার জোগাড়।

এই ঠিক তার সেই সরযূর কথা! পারুল সরযূকে এখনো অতিক্রম করতে পারছে না।

ঢোঁক গিলে পারুল আবার বলে: কেবল রঙ্গমঞ্চে আমারই আপনি নূতন জন্মদান করলেন, হিরণ্ময়বাবু। সেজন্যে আপনার কাছে আমি বাকি জীবন কৃতজ্ঞ থাকবো।

হঠাৎ আবার তখনি থিয়েটারের ঘণ্টা বেজে ওঠে। পারুল ব্যস্ত হ'য়ে বলে: এখানে বসে' আপনার সঙ্গে আজো পর্য্যন্ত ভালো করে' আলাপ করতে পারলুম না। একদিন আমার বাড়ি যাবেন না! মঙ্গলবার-বেস্পতিবার আমার একেবারে ফাঁকা। যাবেন, কেমন? কতোদিন থেকে বলছি। ঠিকানা তো আপনি জানেন।

আমতা-আমতা করে' হিরণ্ময় বলে : বাড়ি গিয়ে কী হ'বে ?

পারুল হেসে বলে : বা, আপনাকে আমি নেমন্তন্ন করছি, যাবেন—এতো বড়ো প্রতিভাবান নাট্যকারের থেকে কতো কী আমাদের শেখবার আছে। বলে' তাড়াতাড়ি সে উইংস্এর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখতে-দেখতে আবার সে সরযূ হ'য়ে ওঠে।

থিয়েটারের শেষে আবার একটু তার সঙ্গে দেখা হয়। সে তখন ননীমাধববাবুর সঙ্গে মোটরে উঠেছে। হিরণ্ময়কে সামান্য একটু আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিস্ফিস্ করে' পারুল বলে : সত্যি একদিন যাবেন। আসচে মঙ্গলবার। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করে' থাকবো। বলে' আলগোছে হিরণ্ময়ের হাতের ক'টি আঙুল ধরে' পারুল করুণ মিনতিতে তার দিকে একটুখানি তাকায়। এখনো সে হয়তো সরযূ আছে।

তারপর মোটর দেয় ছেড়ে। পিছনের সিটে তার পাশে ননীমাধববাবু। হাতে তার একটা পানের ডিবে, গায়ে সিল্কের একটা চাদর, গয়নাগুলি সে ফের পরে' নিয়েছে।

কতদিন থেকেই পারুল হিরণ্ময়কে তার বড়ি যেতে বলছে। কিন্তু কেনই বা যে যাবে হিরণ্ময় ভেবে কিছু ঠিক করতে পারে না। সেখানকার আবহাওয়ার জন্যে অন্য রকম রং, অন্য রকম সেখানকার পারিপার্শ্বিকতা! সেখানে তার সরযূ কোথায়? সেখানে শুধু পারুলের একাধিপত্য—যে-পারুল বয়সে জীর্ণ, বাস্তবতায় অপরিচ্ছন্ন ও স্থূল, আপন সঙ্কীর্ণ অস্তিত্ববোধে একান্ত বন্দিনী। সেখানে গিয়ে হিরণ্ময় কী দেখবে, কা'কে দেখবে? সে

প্রতিমা চায়, পুতুল চায় না। সে আর্টিষ্ট, তার কাছে জীবনের চেয়ে রঙ্গমঞ্চের রহস্য বেশি। সত্যের চেয়ে অপরূপতার এই ভাণ—এই অঙ্গসজ্জা, যে-সজ্জায় পারুল তার বয়সের রেখা ও দিনযাপনের গ্লানিকে নিশ্চিহ্ন করতে পেরেছে; যে-সজ্জায়, যে মধুর একটি কৃত্রিমতার আবরণে, সে সরযূর অলৌকিক মহিমা অর্জ্জন করলে। হোক তা কৃত্রিম, কৃত্রিম না হ'লে সাহিত্য সুন্দর হয় কী করে'? সাহিত্যের কাজ জীবনের মাত্র অনুকরণে নয়, উদ্ঘাটনে। অতএব সরযূকে বাস্তব জীবনের আয়তনে সে দেখতে চায় না। রঙ্গমঞ্চের পারুলই হচ্ছে সরযূ, পাদপ্রদীপের আলোয় দাঁড়িয়ে সে হিরণ্ময়ের সম্বর্দ্ধনা নিক্।

যে বাঙালি-মেয়ে এক রাত্রে স্বামীর গৃহত্যাগ করে' চলে' যায়, এবং শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যেও যে অনুশোচনায় গলে' গিয়ে স্বামীর পায়ের তলায় এসে আছ্‌ড়ে পড়ে না—এত যার নিষ্ঠুর বিদ্রোহ, তাকে নিয়ে নাটক জমবে—বাঙালি দর্শকের নীতিজ্ঞান এখনো এতটা অবনত হয় নি। পয়সা দিয়ে এই অন্যায় সমাজদ্রোহিতাকে কে সমর্থন করবে? অতএব গেল 'সরযূ' বন্ধ হ'য়ে। লোকে যা নেবে না, উপন্যাস হ'লে তা বরং জোর করে' চালানো যায়, কিন্তু নাটক চালানো যায় না।

অতএব 'সরযুর' বদলে সেখানে রমেন রায়ের একখানি অপেরা খোলা হ'লো।

হিরণ্ময় দেখতে গিয়েছিলো অবিশ্যি। তাকে আজকাল কেউ দরজায় বাধা দেয় না, সর্ব্বত্র তার অব্যাহত অধিকার।

অপেরাটির নাম 'মন-কাড়াকাড়ি'—সবশুদ্ধু তার বত্রিশখানা গান। অগ্নি-নৃত্য, সর্প-নৃত্য, বাত্যা-নৃত্য, ধ্বংস-নৃত্য—মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে নৃত্য। অসিযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ। মেয়ে চুরি, জলে ঝাঁপ, পাহাড় থেকে পতন!

প্রথম দৃশ্যেই জমকালো নাচ। ষ্টেজভর্ত্তি সখীর বন্যা, উড়ন্ত তাদের বেণী, ঘুরন্ত তাদের ঘাগরা। রামধনুর টুক্‌রো।

নাচ সুরু হ'লো। হিরণ্ময় ঘাড় উঁচিয়ে দেখলে। দেখলে, নৃত্যশীলাদের অধিনায়িকা হচ্ছে পারুল। সমস্ত শরীর লীলায়িত করে' সেও নাচছে, লাফাচ্ছে, ঘুরে-ঘুরে যাচ্ছে। মুখময় পেণ্ট, গা-ময় ঝল্‌মলে উড়্‌নি, ফিন্‌ফিনে ফিতে। শরীর দুর্ব্বল, রেখায় কদর্য্য লোলুপতা, চোখের চাউনিতে তরল স্ফূর্ত্তি! এই সেই সরযূ! দৃঢ় ব্যক্তিত্বময় আবির্ভাব, দুর্দ্দমনীয় তেজ, কঠিন মর্য্যাদাবোধ—এই তার পরিণতি! হিরণ্ময় উঠে পড়লো।

গ্রীন্‌-রুমের ধারে পারুলের সঙ্গে তার একবার দেখা হ'য়ে গেল। পারুল খুসি হ'য়ে বল্‌লে,—এসেছেন? আমার ঘরে গিয়ে বসুন। মাইরি, চলে' যাবেন না যেন।

হাতে তার একটা গ্লাস। হিরণ্ময় বিরক্ত হ'য়ে ওটার প্রতি ইসারা করে' বল্‌লে,—ও কী?

পারুল খিল্‌খিল্‌ করে' হেসে উঠলো: ভারি তেষ্টা পায় গান গেয়ে। গলাটাকে একটু ভিজিয়ে নিচ্ছি, শরীরটাও সঙ্গে-সঙ্গে চাঙ্গা হ'য়ে উঠছে। বসুন, অনেক কথা আছে। সিনটায় আবার একটা একলা নাচ আছে। গ্লাসটা ধরুন ততোক্ষণ।

হিরণ্ময় সরে' দাঁড়ালো। বাকিটা এক ঢোঁকে শেষ করে' শূন্য গ্লাসটা এক সখীর কোলে আলগোছে ছুঁড়ে দিয়ে পারুল নাচতে গেল। দ্রুত, সশব্দ করতালি ও হর্ষধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ ভেঙে পড়লো। আবার, আবার, আরো চাই। আরো।

হিরণ্ময় বুঝলে, একেই বলে গুণগ্রহণ। প্রেক্ষাগৃহের বিশাল জনমণ্ডলী যখন নিস্তব্ধ হ'য়ে থাকে, তখন বুঝতে হবে তারা নিদারুণ বিরক্ত হচ্ছে, ভবিষ্যতে আর কোনোদিন এখানে পদার্পণ করবে না বলে'ই তাদের নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা! একমুহূর্তও তাদের চুপ করে' থাকতে দেয়া হবে না।

হিরণ্ময় ধীরে-ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলো।

জনসাধারণের জন্যেই থিয়েটার, এবং এই জনসাধারণ সরযুকে চায় না, চায় পারুলকে।

নাটকের চেয়ে উপন্যাস তাই অনেক অভিজাত। হিরণ্ময় তাই এখন থেকে উপন্যাস লিখতেই মন দেবে। নায়িকা তার অশরীরী, খণ্ডিত আবির্ভাবে সে আবিল নয়। জীবনের চেয়ে অতিরিক্ত, সত্যের চেয়েও সে সুন্দর!

অভিবাদন

মিস্ অনীতা চ্যাটার্জি এখানকার নতুন হেডমিস্ট্রেস্ হ'য়ে এসেছেন। বাঁধা, স্কুলের লাগোয়া কোয়ার্টারে না উঠে নিয়েছেন আলাদা বাসা, ছোটখাটো দোতলা পাকা দালান, একজনের জন্যে জায়গা সেখানে অনেক। নিজেকে নিয়েই তাঁর থাকা, জীবনে তিনি খুঁজেছেন শুধু এই নিভৃতি। এটা তাঁর পরাভবের পরিচয় নয়, বরং তাঁর পরিস্ফীত ঔদ্ধত্যের—আর-সবাইর মতো গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে' থাকতে তাঁর ঘিন্‌ঘিন্ করে।

এই নাক-সিঁটকানো, উত্তুঙ্গ আভিজাত্যটাই তাঁর শরীরের একটা গুণবাচক বিশেষণ। পাঁজির পাতায় বয়েস তাঁর প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু শরীরে তার কোনো উল্লেখ নেই। নারীদেহের সঙ্গে তরবারি, নির্ঝরিণী, বেতস বা লবঙ্গলতার তুলনা দেয়া যায়, কিন্তু মিস্ চ্যাটার্জি হচ্ছেন একটা উদ্ধত, উচ্চণ্ড রথদণ্ড। তাঁর আঁটসাঁট জমাট শরীরে নিরেট একটা রুটিনের রূঢ়তা। পৃথিবীর দিকে এমন ভ্রূকুটি-কুটিল চোখে তিনি তাকান, যেন, তাঁর সঙ্গে কোনো চালাকি চলবে না, নিমেষে তিনি তার সমস্ত ছন্দপতন ধরে' ফেলেছেন।

তার প্রতি তাঁর এতোটুকু অনুগ্রহ নেই, অনুকম্পা নেই। তাঁর দুই চোখে ঠিকরে পড়ছে নির্বাষ্প নিষ্ঠুরতা।

নিষ্ঠুর না হ'লে বাঁচা যায় না, মিস্ চ্যাটার্জির এই হচ্ছে অভ্রভেদী অহঙ্কার। তিনি বেঁচে গেছেন, এই নিষ্ঠুরতাই ছিলো তাঁর রক্ষাকবচ। তিনি যে কোনোদিন কাউকে ভালোবাসতে পারেন নি তার কারণ তাঁর এই উদ্ধত ভঙ্গিটা কখনো তিনি ভীরুতায় নামিয়ে আনতে পারেন নি। বিয়ে না-করার পিছনেও ছিলো এই অপ্রতিরোধ্য, প্রকৃতি-প্রেরিত বশ্যতার লজ্জা। দেখতে-দেখতে একনাগাড়ে কখন তিনি চল্লিশটা বছর জীবনের ব্যবসায় উড়িয়ে দিয়ে এসেছেন! লাভ তাঁর কম হয় নি,—ক্ষণস্থায়ী অনুভূতি নয়, স্তূপীকৃত অভিজ্ঞতা। জানতে আমার আর কিছু বাকি নেই, জীবনের সব জারিজুরি আমি ধরে' ফেলেছি,—এমনি একটা দানবিক স্পর্দ্ধা তাঁর শরীরের উপর দিয়ে খেলে যাচ্ছে। তাঁর জীবন ব্যাকরণের কঠিন একটা সূত্র, প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি একজন উন্নাসিক শিক্ষয়িত্রী।

তিনি বাস করছেন রুটিনের দুর্ভেদ্য দুর্গের অন্তরালে, নিশ্ছিদ্র নিশ্চিন্ততার অন্ধকূপে। তাঁর বয়েসটা তাঁর কাছে একটা প্রকাণ্ড বিত্ত, তাঁর সাহস তাঁর এই অভ্যস্ত নির্জ্জনতায়। জীবনে কিছু যেমন তাঁর আশা করবার নেই, তেমনি ভয় করবারো নেই। আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ, সংহত, শৃঙ্খলায়িত—তিনি নিয়ে আছেন তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য-তীব্রতা

তাঁর এই তাপসী, তেজস্বিনী মূর্ত্তি, এই তাঁর আয়সী রণসজ্জা।

যাই হোক্, মিস্ চ্যাটার্জি তো ছোটখাটো দেখে একটি বাসা নিলেন। থাকবার মধ্যে দিনে তাঁর কাজ, রাতে তাঁর নির্জ্জনতা—নিয়মের নিগড়ে বাঁধা একটা অন্ধ দিনানুগত্য। তার মাঝে কোথাও এতোটুকু ফাঁক নেই, ফাটল নেই, চারদিকে শুধু দেয়ালের দেশ। ভীষণ নির্ব্বাক, ভীষণ বধির।

কিন্তু রাস্তার ওপারে প্রায় এ-মাপেরই ছোট একটি বাড়ি ক'দিন থেকে তাঁর মনে ভারি একটা ভাবনা ধরিয়েছে।

বাড়িটা যে কী ধরনের অনেক গবেষণা করে'ও তিনি তা ঠিক করতে পারছেন না। কিম্বা মনে-মনে কিছু একটা ঠিক তিনি করেছেন। এই ভদ্র, সম্ভ্রান্ত পাড়ায় এমন ধরনের একটা বাড়ি যে কী করে' এলো, কী করে' যে আসতে পারে কে বলবে? এই হাওয়ায় মিস্ চ্যাটার্জি যেন স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস নিতে পাচ্ছেন না।

বাড়িটা একটি মেয়ের, নিজের না হোক্, অন্তত সে সেটা ভাড়া নিয়েছে। বয়েস উনিশ-কুড়ির বেশি হ'বে না, এমন প্রগল্‌ভ সুন্দর যে ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদপৃষ্ঠায় শোভা পেতে পারে, অথচ—করুণা করতেও মিস্ চ্যাটার্জি মনে-মনে কলুষিত হ'য়ে ওঠেন—এই রূপ নিয়ে সে কোথায় নেমে এসেছে! এই দৈব দেহটার উপরেও তার কিনা এতোটুকু শ্রদ্ধা নেই। যে-দেহ ছন্দে ও দ্যুতিতে গীতিমান হ'তে

পারতো তাকে করে' তুলেছে সে কিনা স্থূল একটা ইন্ধন। যে-জীবন হ'তে পারতো তার দিবালোকের তারা, তাই হয়েছে কিনা শুকনো একমুঠো ধুলো। সে পুড়ছে, এককণা আলো দিচ্ছে না।

এলোমেলো চুলে মাথায় ফাঁপানো খোঁপা, ঠোঁটে গাঢ় করে' লিপ-ষ্টিক্ বুলোনো, ভুরু ছ'টো কামিয়ে পরে সরু করে' তুলি টানা হয়েছে কিনা দূর থেকে ঠিক বোঝা যায় না—ঐ পারের মেয়েটি যখন মুখে একটা সিগ্রেট নিয়ে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, এপার থেকে মিস্ চ্যাটার্জির তখন শুধু আত্মহত্যা করতেই বাকি থাকে। রূপের সঙ্গে-সঙ্গে রুচিও কি এমনি করে' জলাঞ্জলি দিতে হয়? জীবনের সমস্ত সম্পদ হারিয়েও কি মানুষের এতোটুকু মাত্রাজ্ঞান থাকতে নেই?

মেয়েটির অবস্থা যে বীভৎস রকম ভালো, অনেক মিস্ চ্যাটার্জির চেয়েও যে সে বেশি রোজগার করে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এখান থেকে তার উপরের ঘর ছ'টো চোখে পড়ে, একটা শোবার, পাশেরটা বসবার। শোবার ঘরে প্রশস্ত খাটে উঁচু জাজিমের উপর পুরু বিছানা করা, বসবার ঘরটা অসংখ্যেয় সোফায়-সেটিতে আকীর্ণ। ঘর ছ'টোর রুক্ষ চাকচিক্যে চোখে ধাঁধা লাগে। যেন ঐশ্বর্য্যের একটা প্রতপ্ত মরুভূমি। সন্ধ্যার দিকে বসবার ঘরে অনেকগুলি লোক জমায়েৎ হয়, বেশে-বাসে, আদব-কায়দায় একেকটি

অভিবাদন

আপাদমস্তক 'কক্সকোম্', সুরু হয় হল্লার উত্তাল হোলিখেলা মেয়েটিও, পরনে ক্যাশমিয়ারের সাড়ি, পায়ে কিড্ স্যাণ্ডেল, গলায় ওপেল নেকলেস, হাতে সোনালি সিগ্রেট-কেস্ নিয়ে আসে,—মেয়েটি যেন সেই মুখর মক্ষিকাকুলের মধ্যমণি। পোড়ে সিগ্রেট, ধোঁয়ায় সমস্ত ঘর বেলুনের মতো উড়তে থাকে। দমকে-দমকে হাসির ঝাপ্টা ওঠে কথার অফুরন্ত শিলাবৃষ্টির মাঝে। আসে ট্রে-তে করে' চা,—পিচ্, অর্কিড্, স্যাম্পেন রঙের পেয়ালা। মাঝে-মাঝে মেয়েটি উঠে গিয়ে অর্গ্যান্ বাজাতে বসে, গলা ছেড়ে গান ধরে। গান সে ভালোই গায় বলতে হ'বে, মিস্ চ্যাটার্জি লক্ষ্য করে' দেখেছেন, গানের পদগুলি তার যা-হোক বেশ রুচিসম্মত, আড়ালে দাঁড়িয়ে স্কুলের মেয়েরাও তা নিঃসঙ্কোচে শুনতে পারে।

আরো তিনি লক্ষ্য করে' দেখেছেন, ঘরে থাকতে বারে-বারে চোখ তাঁর ওদিকেই কেবল ছুটে যায়—ঐ ভিড়ের থেকে একে-একে সবাই এদিক-ওদিক খসে' পড়ে, কেবল একটি বিশেষ চেহারার লোক, হ্যাঁ, চেহারা দেখে ভদ্রলোকই তাকে বলতে হ'বে,—সমস্ত রাতটা নিঃশেষে কাটিয়ে দিয়ে, পরদিন রোদ উঠলে তবে এখান থেকে গা তোলে। তার আচরণের এই নির্ভুল প্রাত্যহিকতাটা তাকে মিস্ চ্যাটার্জির চোখে সবিশেষ চিহ্নিত করে' তুলেছিলো। রোজ বিকেলে মোটরে করে' সবাইর আগে সে আসে, আর নিজেই ড্রাইভ

করে' সকালবেলা সবার শেষে সে বিদায় নেয়। সময় ও সান্নিধ্যের এই বিস্তার ও গাঢ়তা থেকে মিস্ চ্যাটার্জির আর সন্দেহ নেই, এই ভদ্রলোকই হচ্ছে ঐ মেয়েটির একান্ত। এতোক্ষণ যা হোক্ বিচিত্রিত জনতায় মেয়েটি তবু একটা মিতাচারের সীমা মেনে চলে, কিন্তু এই ভদ্রলোকের সম্পর্কে যখন তার ব্যবধানটা ধীরে-ধীরে সঙ্কিপ্ত হ'য়ে ওঠে, তখন এক সময় হঠাৎ তার চারপাশ থেকে উড়ে যায় সব কুণ্ঠার কুয়াসা, উদ্বেল হ'য়ে ওঠে উজ্জ্বল, সুতীব্র উন্মুক্তি। মেয়েটি তার শরীর লীলায় তরল করে' হয়তো ভদ্রলোকের সামনে হাল্কা একটু নাচ সুরু করে, দু'পা নেচে হঠাৎ খিল্খিল্ করে' হেসে ওঠে, কখনো বা তার বাহুর বিস্ফারিত ঢেউয়ে ভদ্রলোকের কণ্ঠতট সে ছুঁয়ে পালায়। তারা যে মাটির থেকে অনেকটা উঁচুতে আছে, এই যেন তাদের যথেষ্ট আব্রু, এতেই যেন তারা যথেষ্ট নিরাপদ। মিস্ চ্যাটার্জির সঙ্গে অনেকবার মেয়েটির অসাবধান চোখোচোখি হয়েছে, কিন্তু ঘরের পর্দাটা টেনে দেবার পর্য্যন্ত তার উৎসাহ নেই। আঘ্রাণে তিনি তার আনন্দের অর্দ্ধেক স্বাদ নিচ্ছেন, অপরাধটা যেন তাঁরই—মেয়েটির চোখে সেই সকৌতুক ভৎ'সনা। তাঁর চোখে এতো দীপ্তি না সহ্য হয়, তিনিই অনায়াসে তাঁর ঘরের জানলাটা বন্ধ করে' দিতে পারেন।

ঘরের জানলাটা বন্ধ করে' দিয়েও মিস্ চ্যাটার্জির নিস্তার নেই হাওয়ায় ভেসে আসে তার কথার টুক্রো, গানের

স্ফুলিঙ্গ। তার এলোমেলো আঙুলে বাজনার তুফান চলেছে, যেন উদ্দাম হাওয়ায় উড়ছে সোনালি ধুলো। যেন কোথায় সমুদ্রে ঝড় উঠেছে, অরণ্যে লেগেছে আগুন। সেই শব্দের উত্তরে মিস্ চ্যাটার্জির বন্ধ জানলাটা গোমরা-মুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকে। মেয়েটির মুখের ঐ সব হাসি ও কথা—শব্দ, না রঙ, মিস্ চ্যাটার্জি অনেক সময় তা বুঝতে পারেন না: তিনি ঐ সব শুনছেন, না দেখছেন, তাঁর ভীষণ ধাঁধা লাগে। তাঁর নির্জ্জন, অন্ধকার ঘরে মেয়েটির সেই হাসির টুকরোগুলি ফুলের স্খলিত পাপড়ির মতো উড়তে থাকে, তিনি স্পষ্ট তাদের গন্ধ পান, স্পষ্ট তাদের তিনি ছুঁতে পারেন। মেয়েটি এতো সজীব, এতো অনর্গল! সে যে জীবনে ভীষণ খুসি, এই কথাটা তীব্র আর্ত্তনাদ করে' তার জানানো চাই। জীবনকে বহন করবার জন্যে যে তার একটা আগ্নেয় দেহ আছে, তা সে এই আনন্দের বন্যতায় দিয়েছে লেলিহান করে'। তার এই সুখ ও এতো সুখ যেন চোখ মেলে দেখা যায় না।

মিস্ চ্যাটার্জি না দেখলেও মেয়েটি তাঁকে গায়ে পড়ে' দেখাবে। তার চারপাশের আকাশে এতো আলো যেন আর ধরছে না। কখনো, চা খাবার সময়, মুখে একটা আস্ত কেক্ পুরে ওপার থেকে খেয়ে-খেয়ে ভদ্রলোককে এগিয়ে আসতে বলে—যবনিকা পতন পর্য্যন্ত দেখবার অবিশ্যি তাঁর সাহস নেই। তারপর সোফার উপর সুরভিত গা ঢেলে দিয়ে বিস্তৃত আলস্যে যখন সে মুখ বেঁকিয়ে সিগ্রেটের ধোঁয়া

ছাড়ে, তখন মিস্ চ্যাটার্জির সমস্ত স্নায়ু-শিরা পিচ্ছিল সরীসৃপের মতো সর্ব্বাঙ্গে কিল্‌বিল্ করে' ওঠে। কোনো-কোনো দিন বৈকালিক আড্ডাটা বসে না, সে-সেদিন সেই বিশেষ ভদ্রলোকের সঙ্গে মেয়েটি মোটরে করে' বেড়াতে বেরোয়, মাথায় না থাকে ঘোমটা, ওড়ে চুল, এঞ্জিনের সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও কলধ্বনিত হ'তে থাকে। ভদ্রলোকের মোটর নিয়ে আসা না পর্য্যন্ত মেয়েটি তার ঝি-র হাতে চুল বাঁধে, আল্‌তা পরে, ঠাট করে' কপালে আবার সিঁদুর আঁকে, আর মোটরের একবার হর্ন শুনতে পেলে তার যে একখানা চেহারা হয়, সূর্য্যাস্তের সময় প্রত্যঙ্কী দিগ্‌বধূও রক্তিমায় ততোটা প্রগল্‌ভ হ'য়ে ওঠে না। ভদ্রলোক উপরে আসতেই মেয়েটি আনন্দে রঙিন একটা কুঙ্কুমের মতো ফেটে পড়ে, ভদ্রলোকের পকেট হাট্‌কায়, চুল এলোমেলো করে' দেয়, নেক্‌টাই ধরে' টানাটানি সুরু করে।

না, এই ভদ্র পাড়ার মধ্যে এই কেলেঙ্কারির কখনো প্রশ্রয় দেয়া চলে না। এই উত্তাল হাসি-হুল্লোড় যে করে'ই হোক বন্ধ করে' দিতে হ'বে। মিস্ চ্যাটার্জি দু'দিনে যেন ক্লান্ত, বিশীর্ণ হ'য়ে উঠলেন। রাতে তাঁর ভালো ঘুম হয় না, মেয়েটির শরীরের সেই লঘু, বঙ্কিম ভঙ্গিগুলি তাঁর চোখের পাতার উপর সির্‌সির্ করতে থাকে, তিনি যেন তাঁর চারিদিকের হাওয়ায় তার গায়ের ফেনিল উষ্ণ উচ্ছলতার ঝাঁজ পান, তার কণ্ঠস্বরগুলি যেন বিদেশী পাখির মতো পথ ভুলে

তাঁর এই স্তব্ধতার নীড়ে উড়ে-উড়ে আসে। না, এই উচ্ছৃঙ্খল কদাচারের একটা প্রতিকার চাই। তার চোখের সামনে এতো বড়ো একটা দুর্নীতি তিনি কখনোই থাকতে দেবেন না।

কোয়ার্টার থেকে য়্যাসিষ্টাণ্ট্ হেডমিস্ট্রেস্ মিসেস্ বনবাসিনী গাঙ্গুলি ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখতে এসেছেন। জানলাটা অবিশ্যি বন্ধ, খড়খড়ি তুলে চোখটা তেরছা করে' ও-বাড়ির তিনি নাগাল পেলেন। দৃশ্যটা দেখে হঠাৎ যেন শিউরে উঠেছেন, সর্ব্বাঙ্গে এমনি একটা সাতঙ্ক ভঙ্গি করে' তিনি বলে' উঠলেন: দেখবেন আসুন, দেখবেন আসুন, মিস্ চ্যাটার্জি। কী ভয়ানক কথা! লোকটার সিগ রেটের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে মেয়েটা সিগ্রেট ধরাচ্ছে।

মিস্ চ্যাটার্জি মুখাভাস ধূসরতরো করে' বল্লেন,—দেখে-দেখে চোখে কড়া পড়ে' গেলো।

—নীল্‌চে গ্লাসে করে' ওরা ও-সব কী খাচ্ছে বলুন তো?

নির্লিপ্ত গলায় মিস্ চ্যাটার্জি বল্লেন,—কী আবার খাবে! আইস-ক্রিম নিশ্চয় নয়।

—ছি ছি ছি, পাখির ফাঁকে দেখে মিসেস গাঙ্গুলি তৃপ্ত হ'তে পারছিলেন না, জানলার ছিট্‌কিনিটা খুলে ফেলতে-ফেলতে বল্লেন,—মেয়েটা নাচতে সুরু করে' দিয়েছে দেখছি। এখনো স্পষ্ট দিনের আলো আছে, রাস্তায় এতো রাজ্যের লোক—ছি ছি ছি!

মিস্ চ্যাটার্জি গম্ভীর গলায় বল্‌লেন,—জানলাটা আর খুলবেন না।

—আমাদের জানলা, আমাদের খুলতে কী দোষ! মিসেস্ গাঙ্গুলি প্রতিবাদ করলেন: তবু যদি আমাদের দেখে একটু চক্ষুলজ্জা হয়।

—যার চোখ নেই, তার আবার চক্ষুলজ্জা!

জানলাটা খুলতে না পেয়ে মিসেস্ গাঙ্গুলি মরমে মরে' গেলেন। মাথায় হাত তুলে বল্‌লেন,—কিন্তু ভাবুন দেখি কী কাণ্ড! এই সহরে এমন উৎপাত তো কোনোদিন ছিলো না।

—চুলোয় যাক্ গে। চিন্তায় মিস্ চ্যাটার্জির মুখ-চোখ ঘোলাটে হ'য়ে উঠলো: এ নিয়ে সত্যি একটা আন্দোলন করা উচিত, যে করে' হোক দিতেই হ'বে ওকে সরিয়ে। আমি ভাবছি স্কুলের সেক্রেটারির সঙ্গে এ-সম্পর্কে আলাপ করবো। নুইসেন্স্! এই রাস্তা দিয়ে মেয়েরা রোজ ইস্কুলে যাচ্ছে—অসহ্য।

খড়খড়ির ফাঁকে আরেকবার চোখ পাঠাবার চেষ্টা করে' মিসেস্ গাঙ্গুলি বল্‌লেন,—আর, হাসির কী ঢেউ! আহ্লাদে ফেটে একেবারে আটখানা হ'য়ে পড়ছেন।

—দিবা-রাত্র এই হাসি। এই হাসি শুনে-শুনে কানে আমার পোকা পড়ে' গেলো, মিসেস্ গাঙ্গুলি। মিস্ চ্যাটার্জি বিজ্ঞ দার্শনিকের মতো মুখভাব বৌদ্ধ, প্রশান্ত করে' তুললেন: কিন্তু মেয়েটার কেন যে এতো ফুর্তি কে জানে। মাঝে-মাঝে

ওর জন্তে খুব কষ্ট হয়, ওর ভবিষ্যৎ ভেবে ভয়ে আমারই ঘুম আসে না। কিন্তু হতভাগীর না আছে ভয়, না আছে অনুতাপ। চুলোয় যাক্ গে, আমি শেষ পর্য্যন্ত পুলিশে খবর দেবো দেখবেন।

—দেয়াই তো উচিত একশোবার।

পরদিন রবিবার, দুপুরে মিস্ চ্যাটার্জি অনেক বই-পত্র নেড়ে-চড়ে ফার্স্ট ক্লাসের মেয়েদের জন্তে পেপার সেট করেছেন বসে'-বসে', পাশের সিঁড়ি দিয়ে কিসের একটা ছায়া তাঁর সামনে উঠে এলো। তার চেয়ে সূর্য্য আজ হঠাৎ নিবে গেলেও যেন দু'-চোখ মেলে তা বিশ্বাস করা সহজ হ'তো, কিন্তু এ কী অসম্ভব কাণ্ড—তাঁর চোখের সামনে সামনের বাড়ির ঐ মেয়ে!

এক ঝট্কায় মিস্ চ্যাটার্জি লাফিয়ে দূরে ছিট্কে পড়লেন। গলা চিরে কোনো রকমে তাঁর একটা আওয়াজ বেরুলো: তুমি—তুমি এখানে? তুমি এখানে কী করতে এসেছ?

মেয়েটি সপ্রতিভ, সস্মিত মুখে বল্লে,—আমাকে আপনি চিনবেন না, আমার নাম অণুভা। আমার দিদি প্রতিভা আপনার ছাত্রী ছিলো। কিন্তু কা'র ভাগ্যে কী আছে কে

বলবে বলুন। দিদি গেলেন চলে' সিঙ্গাপুর, আর আমি এসে পড়লুম এ কোথায়!

মিস্ চ্যাটার্জি তার দিকে খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো চেয়ে রইলেন। দূর থেকে তাকে যেমন প্রখর কুৎসিত দেখাতো, সামনাসামনি ততো অবিশ্যি তাকে খারাপ লাগছে না, কিন্তু মুখের তার এই নির্লজ্জ হাসি, তার বেশে-বাসে আধুনিক ফ্যাসানের এই স্পর্দ্ধিত ঔদ্ধত্য, যেন তাঁর দুই চোখের উপর তীক্ষ্ণ চাবুক মারতে লাগলো। রুক্ষ গলায় তিনি জিগ্‌গেস করলেন: কিন্তু এ-বাড়িতে তোমার আসবার কী হয়েছে?

—বা, এতো সামনে আপনার বাড়ি, রোজ জানলায় দেখা হয়, একটু এলুমই না হয় বেড়াতে। অণুভা মুখ টিপে হাসতে লাগলো।

মিস্ চ্যাটার্জি তেজী গলায় বল্লেন,—না। এটা বেড়াবার জায়গা নয়, এটা এক ভদ্রমহিলার বাড়ি।

অণুভা খিল্‌খিল্ করে' হেসে উঠলো: তাই না-হয় হ'লো। আপনার এখানে বেড়াবার জায়গা নেই, মানলুম, কিন্তু আমার ওখানে যাবেন দয়া করে' আজ সন্ধেয়? আপনাকে আমি নেমন্তন্ন করতে এসেছিলুম।

—তোমার ওখানে যাবো? আমি? রাগে মিস্ চ্যাটার্জি বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলেন: তুমি কী ভেবেছ! তুমি বাড়ি বয়ে' আমাকে অপমান করতে এসেছ? তুমি যাও বলছি এখান থেকে, এক্ষুনি, এই মুহূর্ত্তে।

অণুভা এতোতেও অপ্রস্তুত হ'লো না। দরজার কাছে সরে' গিয়ে হাসতে লাগলো।

—দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছো কী ওখানে?

—বা, হাসবো না? এতো কষ্ট করে' সেজে-গুজে নেমন্তন্ন করতে এলুম, তা আপনি একটু বসতে পর্য্যন্ত দিলেন না, সটান তাড়িয়ে দিলেন। এটা একটা হাসবার কথা নয়? অণুভা তরল, রূপোলি গলায় বল্‌লে,—কী করবো বলুন, এটা আমার একটা ভীষণ মুদ্রাদোষ, আমি কেবল হাসি। বলে' সে সিঁড়ি দিয়ে তরল জলস্রোতের মতো নিচে নেমে গেলো।

মিস্ চ্যাটার্জি সিঁড়ি পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন। চাপা অথচ কটু কণ্ঠে বল্‌লেন,—তোমার এ হাসি কী করে' বন্ধ করতে হয় তা আমি একবার দেখে নেবো।

অণুভা চলে' গেলে মিস্ চ্যাটার্জি রাগে একটা বেড়ালের মতো ফুলতে লাগলেন। রইলো পড়ে' তাঁর পেপার সেট্ করা, বিকেল হ'তে-না-হ'তেই চললেন তিনি সেক্রেটারির বাড়ি। এর একটা হেস্তনেস্ত করতেই হ'বে আজ। কোথাকার কে-একটা মেয়ে তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁকে অপমান করে' যাবে! তার নামে নিদেনপক্ষে একটা ট্রেস্‌পাসের মোকদ্দমাও তিনি করবেন না?

সেক্রেটারি এই মহকুমার এস্-ডি-ও। বেতের মোড়ায় বসে' চীনে-মাটির প্লেটে করে' আস্ত একটা পেঁপে খাচ্ছিলেন, এমনি সময় মিস্ চ্যাটার্জির আবির্ভাব হ'লো। পেঁপে খেতে-খেতে

প্রাথমিক শিষ্টালাপটা সেরে নিয়ে এবার তাঁরা আসল বিষয়ে এসে পৌঁচেছেন।

সেক্রেটারি জিগ্‌গেস করলেন : কোন বাড়িটা বলুন তো?

—আমার বাসাটা দেখেছেন তো?

—হ্যাঁ।

—ঠিক তার উল্‌টো দিকে।

—বা, ওটা তো ডিপ্‌টি-বাবুর বাসা। মিষ্টার দত্ত, এই আপনি আসবার মাসখানেক আগে যিনি এসেছেন।

—না, না, সেটা নয়। মিস্‌ চ্যাটার্জি তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করে' উঠলেন : তার পাশেরটা হ'বে।

—বা, এ-পাশে তো একটা বটগাছ, ও-পাশে থাকেন উকিল রামরতন বাবু। আপনার অপজিটে আর বাড়ি কই?

মিস্‌ চ্যাটার্জি স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে রইলেন। বল্‌লেন,—আর বাড়ি নেই? আপনি ঠিক জানেন?

—বা, আপনারই তো বেশি জানবার কথা। আচ্ছা, সেক্রেটারি জেরা সুরু করলেন : মেয়েটার কতো বয়েস?

—এই উনিশ-কুড়ির মতো।

—কী রকম চেহারা?

—মন্দ নয়, তবে ঠোঁটে রঙ মাখে, সিগ্‌রেট খায়।

—সিগ্‌রেট খায়? সেক্রেটারি হেসে উঠলেন।

—শুধু কি তাই? মিস্‌ চ্যাটার্জি প্রকাণ্ড একটা ঢোঁক গিললেন।

—হ্যাঁ, শুধু কি তাই? তা আপনি-আমি কী করতে পারি?

—কিছু করতে পারি না? মিস্ চ্যাটার্জি দাঁড়িয়ে পড়লেন।

—না, উনি এক ভদ্রলোকের বিবাহিতা স্ত্রী—

—বিবাহিতা স্ত্রী! তাঁর গলাটা দুই হিংস্র থাবায় পিষে ধরলেও মিস্ চ্যাটার্জি এতো অভিভূত হ'তেন না।

—হ্যাঁ, সেক্রেটারি মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন: উনিই মিসেস্ দত্ত। কী যেন বেয়াড়া একটা নাম।

মিস্ চ্যাটার্জির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো: অণুভা—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অণুভা দত্ত।

ভেঙে যেন শতধা বিদীর্ণ হ'য়ে গেছেন এমনি অসহায় মুখে মিস্ চ্যাটার্জি জিগ্‌গেস করলেন: আপনি সত্যি জানেন ওদের বিয়ে হয়েছে?

—বা, জানি না মানে? এই দেখুন না, আজ ওদের বিয়ের কী একটা য়্যানিভার্সারি, না, বার্ষিকী কি হ'বে, আমাকে সকাল বেলা নেমন্তন্ন করে' গেছে। আপনাকে করে নি?

সেক্রেটারি ছাপা একটা চিঠি নয়ে এলেন। মিস্ চ্যাটার্জি তার দিকে খানিকক্ষণ শুকনো, নিষ্প্রাণ চোখে চেয়ে রইলেন। বললেন,—বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এ কেমন তাঁদের ব্যবহার?

—ব্যবহার? সেক্রেটারি প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন: তা ঠিক আপনার জানবার কথা নয়, মিস্ চ্যাটার্জি। ওদের নতুন বিয়ে হয়েছে কিনা, তাই বোধ হয় একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে' ফেলছে। বিয়ে করে' এই তো ক'টা দিন মানুষের আছে, তারপর বিয়ে হোক বা না-হোক, সেই তো একঘেয়েমি। এ-সময়টা মনের একটা উদ্দাম ছুটি পাওয়া দরকার—বিশেষ করে' দত্ত-র যখন এ লাভ-ম্যারেজ।

—লাভ-ম্যারেজ? মিসেস্ চ্যাটার্জি বিবর্ণ মুখে আর্তনাদ করে' উঠলেন।

—দস্তুরমতো। মিসেস্ দত্তই অবিশ্যি এ-ব্যাপারে বেশি য়্যাগ্রেসিভ ছিলেন, তাই হয়তো তাঁর এই দুরন্ত স্ফূর্তি। সেক্রেটারি শেষকালে ছোট একটি টিপ্পনি কাটলেন: যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে সত্যি-সত্যি বিয়ে করতে পারলে মানুষের কী রকম চেহারা হয়, তার কোনো ধারণা আমার নেই। মিসেস্ দত্তকে দেখে সেই উন্মত্ত সুখের কিছুটা আভাস হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

হেঁটমুখে, ক্লান্ত, কাতর পায়ে মিস্ চ্যাটার্জি ফিরে এলেন। যেন এই মাত্র শ্মশান থেকে ফিরে আসছেন, চিতায় তুলে দিয়ে এসেছেন তার জীবনের মৃত অতীত—এমনি উদাস, বিশীর্ণ তাঁর চেহারা।

এখুনি বাড়ি ফিরে যেতে কিছুতেই তাঁর পা উঠলো না। সেই আনন্দ-আলোকিত, উৎসব-মুখর বাড়ির সামনে এই

বিষণ্ণ, নিষ্প্রভ দৃষ্টি তুলে ধরতে তাঁর ভীষণ লজ্জা হচ্ছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তিনি চলে' গেলেন মিসেস্ গাঙ্গুলির কোয়ার্টারে।

বল্‌লেন,—জানেন মেয়েটি ভালো, ওর দিদি প্রতিভা আমার ছাত্রী ছিলো। মেয়েটির বিয়ে হয়েছে।

—বলেন কী? মিসেস্ গাঙ্গুলি যেন আকাশ থেকে পড়লেন : বিয়ে হয়েছে?

—রীতিমতো। না, শুকনো একটা রীতি-অনুসারে নয়, দস্তুরমতো ভালোবেসে।

—ভালোবেসে? সে আবার কী কথা? মিসেস্ গাঙ্গুলি কথাটা যেন আয়ত্ত করতে পারলেন না।

—হ্যাঁ, ভালোবেসে। তাই, তাই তার মুখের চেহারা এমন আগুনের মতো লাল, তার শরীর এমন শিখার মতো সুন্দর। মিস্ চ্যাটার্জির গলা, জীবনে এই প্রথম, আবেগে কেঁপে উঠলো : আমারই দেখতে ভুল হয়েছিলো, মিসেস্ গাঙ্গুলি, খুব গভীর, খুব তীব্র করে' ভালো না বাসলে কখনো কোনো মেয়ের এমন চমৎকার চেহারা হয় না।

মিসেস্ গাঙ্গুলির ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে স্কুলের গাড়িতে যখন তিনি রাত করে' বাড়ি ফিরলেন, তখন ও-পারের

বাড়ির উৎসব থেমে গেছে। মিস্ চ্যাটার্জি উপরে তাঁর ঘরে এলেন, ঝি বিছানা করে' রেখেছে, নিরালা শুভ্র বিছানা, —রুদ্ধশ্বাস অন্ধকার ঘরের ভয়াবহ নির্জ্জনতা হঠাৎ যেন কঠিন স্পর্শে চারদিক থেকে তাঁকে আক্রমণ করে' ধরলো। মুক্তি খুঁজবার জন্যে মিস্ চ্যাটার্জি শিয়রের বন্ধ জানলাটা খুলে দিলেন। ওদের ঘর তখন ঘুমে অন্ধকার হ'য়ে গেছে। দক্ষিণের জানলাটা খোলা, দেখা যাচ্ছে মশারির অস্পষ্ট, ধূসর একটা রেখা। দুই তৃষ্ণার্ত্ত, কঠিন চোখ মেলে মিস্ অনীতা চ্যাটার্জি সেই দ্যুতিমান অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলেন,— কিছুতেই আজ তাঁর চোখে ঘুম আসছে না।